গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR)-এর মুখপত্র

অধিকার

মার্চ-এপ্রিল ২০২৪ বিনিময় : ১৫ টাকা

এই সংখ্যায় রয়েছে—

- এপিডিআর: নিজ অবস্থানে দৃঢ়তা বর্তমান সময়ের দাবী / পৃ. ৩
- আরবিআই কি নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার পথে / পৃ. ৮
- মৎস্যজীবীদের মহা বিপদ / পৃ. ১০
- এসএসসি মামলার রায়—এই রায় ন্যায়বিচারের মূলনীতির পরিপন্থী / পৃ. ১১
- লাদাখে চলমান আন্দোলন / পৃ.১৩
- আমার ভারত ওদের ভাষ্য (৬ষ্ঠ কিস্তি)/ পৃ. ১৫
- চিঠি: ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এপিডিআরের কার্যকরী ভূমিকা / পৃ. ১৭
- প্রতিবেদন / পৃ. ২ ও পৃ. ১৮
- তথ্যানুসন্ধান / পৃ. ১৯-২৫
- রিপোর্ট / পৃ. ২৫-৩১
- শুভেচ্ছা বার্তা / পৃ. ৩১

সম্পাদনা : পত্রিকা উপ-সমিতি।
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি,
১৮ নং মদন বড়াল লেন, কলকাতা-১২ এর পক্ষে
সাধারণ সম্পাদক : রঞ্জিত শূর (8017437302)
কর্তৃক প্রকাশিত ও
ইনস্ অ্যান্ড আউটস্, বালি, হাওড়া থেকে মুদ্রিত।
E-mail : apdr.wb@gmail.com
Website : www.apdrwb.in

অধিকার-এর জন্যে লেখা, মতামত পাঠান
apdr.adhikar@gmail.com

সম্পাদকীয়

বিচারব্যবস্থায়ও নাগরিক নজরদারি জরুরি

সংসদীয় গণতন্ত্রে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতবর্ষে এখনকার মত বিচারব্যবস্থার এতটা গুরুত্ব অবশ্য আগে কখনও ছিল কী-না সন্দেহ! কোনও শাসকই নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা চায় না। সব স্বৈরশাসকই বিচারব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করতে চায়। ইন্দিরা গান্ধীও চেয়েছিল, নরেন্দ্র মোদী চাইছে। সাধারণভাবে বিচার ব্যবস্থাও সরকারের সঙ্গেই থাকে। পছন্দের বিচারপতি নিয়োগ করে শাসকেরাও বিচার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। যখনই বিচার ব্যবস্থা কিছুটা স্বাধীন নিরপেক্ষ অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করে তখনই শাসকের চোখ রাঙানীর মুখে পড়ে। ভারতের সুপ্রিম কোর্টও সম্প্রতি ইলেকশন বন্ড ও পিআইবি'র সোশাল মিডিয়া সেন্সর করার ক্ষমতা দেওয়ার আইন বাতিলের মতো দুটো গুরুত্বপূর্ণ রায় দেওয়ায় শাসকের রোষের মুখে পড়েছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে বিজেপি অনুগামী বিপুল সংখ্যক আইনজীবী ও প্রাক্তন বিচারপতিদের স্বাক্ষরিত হুশিয়ারি চিঠি জমা পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে সেটা শেয়ার করে চাপ তৈরি চেষ্টা করেছেন। এর আগেও বারবারই ক্ষমতায় আসার পর থেকে কখনও কলেজিয়াম প্রথাকে বাতিল করে বিচারক নিয়োগের ক্ষমতা সরকারের হাতে নিতে চাওয়া, কখনও বিচারপতি নিয়োগ বন্ধ করে রাখা, কখনও সংসদেরও সংবিধানের বেসিক স্ট্রাকচার বদলের ক্ষমতা নেই এই রায়ের সমালোচনা করে সরকারপক্ষের লোকেরা বারবারই বিচারব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করতে চেয়েছে। বিচার ব্যবস্থাকেও গত দশ বছরে সরকারের বিরুদ্ধে বড়-সড় কোনও রায় দিতে দেখা যায়নি। নির্বাচনী আবহাওয়ায় দু'টি রায়ে কিন্তু তাদের উপর চাপ তৈরি হলো। এবং তারপরেই নির্বাচন কমিশন, ভিভিপ্যাট, সিএএ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা হতাশা তৈরি করলো। অনেক মামলার ক্ষেত্রেই বিচারকদের ভূমিকা নিয়ে অনেকেই ফের প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। সরাসরি চাপ তৈরি ছাড়াও ইতিমধ্যেই বহু বিচারপতি নিয়োগ হয়েছে যারা শাসকের ভাবাদর্শে

প্রভাবিত। সংবিধান নয় মনুসংহিতা বা গোলওয়ালকারবাদই তাঁদের পথ প্রদর্শক আদর্শ। ফলত এমন সমস্ত রায় বা মন্তব্য বিচারপতিরা করছেন যা চমকে ওঠার মতো। ভীমা কোরেগা মামলায় মানবাধিকার কর্মী বিদুষী সোমা সেনের জামিন দিতে গিয়ে এরকমই এক ঝলক দেখা গেল বিচারপতিদের রায়ে। বন্দিদের জামিনে অমানবিক শর্ত দিয়েছেন। বলেছেন, তাঁদের মোবাইল ২৪ ঘন্টা খোলা রাখতে হবে। তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে তাদের মোবাইল ২৪ ঘন্টা সংযুক্ত রাখতে হবে যাতে তদন্তকারী অফিসার তার প্রতি মুহূর্তের কার্য্যকলাপের উপর নজরদারি চালাতে পারে। এই রায় সুপ্রিম কোর্টের! জামিনের সাধারণ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত একটা আদেশ। জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্ট ইউএপিএ মামলায় জামিন দেওয়ার শর্ত হিসেবে ২৪ ঘন্টা জিপিএস লাগানো ব্রেসলেট পরে থাকতে হবে বলে রায় দিচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সঙ্গে কার্য্যত কোন তফাৎ নেই। গৌতম নভলখাকে গৃহবন্দি রাখার জন্য এক কোটি টাকা খরচ দাবি করেছে এন আই এ।

সুপ্রিম কোর্ট তা'তেই মদত দিচ্ছে। মানবাধিকার সরকারের মত আদালতের কাছেও গৌণ হয়ে পড়ছে ক্রমশই। এই অবস্থায় তাই আদালতের ভূমিকায় নজরদারি জরুরী। আদালতের ভূমিকা নিয়েও পদে পদে প্রশ্ন তোলা ছাড়া উপায় নেই। ন্যায় বিচার নাগরিকের অধিকার। এই সত্য বলে যেতে হবে বারে-বারে, সোচ্চারে।

প্রতিবেদন

বিচারের বাণী এভাবেই শুধু কাঁদবে!

বিচারের বাণী এভাবেই শুধু কাঁদবে? তিন বছর চার মাস পার হয়ে গেল ওমর খালিদের দিন কাটছে গারদের অন্ধকারে। এই দীর্ঘ সময়ে তার বিচার এগোয়নি এক পা-ও। অথচ একদিনের জন্যও জামিন মেলেনি তার। ২০২২ সাল, জুন মাসে বিচারপতি এ এস বাপান্না'র নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ নিশ্চয়তা দান করে ছিল যে, ''এই মামলার নিষ্পত্তি হতে লাগবে এক বা দু'মনিট মাত্র!''

তারপরেও ৬ মাস অতি ক্রান্ত! সুপ্রিম কোর্টের বিধি (rules) এবং প্রচলন (convention) অনযুায়ী জামিনের আবেদন শোনার যে প্রক্রিয়া সর্বজন বিদিত, সেখানেও কোন অজ্ঞাত বা সর্বজ্ঞাত (!) কারণে তার জামিনের আবেদন ঠোক্কর খাচ্ছে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের এ-বেঞ্চ থেকে ও-বেঞ্চে। জাস্টিস বোপান্না'র বেঞ্চ থেকে তা চলে গেল বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসুর বেঞ্চে। তারপর সেটা পাঠিয়ে দেওয়া হল বিচারপতি বেলা ত্রিবেদী'র বেঞ্চে। রোস্টার মাস্টারের কোন খেলায় জামিনের আবেদনটি শেষ পর্যন্ত বিচারপতি বেলা ত্রিবেদী'র বেঞ্চে চলে গেল তা সুপ্রিম কোর্টের নিরপেক্ষতা নিয়েই গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

একটা সাদামাটা হালকা অভিযোগে গ্রেপ্তার করে যে-ভাবে একজন গণআন্দলনের সুপরিচিত সক্রিয় ব্যক্তিত্বকে দীর্ঘকাল ধরে আটকে রাখা হয়েছে তাতে শুধু রাষ্ট্রীয় প্রশাসনই নয়, মহামান্য সুপ্রিম কোর্টও, '' বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে ...'', ক্রন্দনের দায়িত্ব এড়াতে পারে না। এই যৌথ অসক্রিয়তা (inaction) গণতান্ত্রিক নাগরিক অধিকার ও সিভিল সোসাইটির কাছে এক হাড় হিম করা বার্তা প্রেরণ করছে। FIR দায়ের করার চার বছর পার করার পরও এখনো বিচারই শুরু হলো না! ড্রাকোনিয়ান UAPA নামক আইনটির বলে এই ধরনের মামলায় আমজনতার কাছে জামিন পাওয়াটাই সুদূর পরাহত হয়ে গেছে।

এপিডিআর-এর মুখপত্র
'অধিকার' পড়ুন ও পড়ান

এপিডিআর-এর সমস্ত
শাখার কাছে রিপোর্ট পাঠানোর
আহ্বান রইল।

এ পি ডি আর: নিজ অবস্থানে দৃঢ়তা বর্তমান সময়ের দাবি

রাহুল চক্রবর্ত্তী

২রা এবং ৩রা মার্চ ২০২৪ মালদায় ৫১ টি শাখা এবং ৩২৭ জন প্রতিনিধির অংশগ্রহণে APDR এর ২৯ তম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র মেনে এই সম্মেলন কাজের প্রশ্নে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ পরিস্থিতি, ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ, ব্যক্তি ছাড়াও গোষ্ঠী বা সমষ্টিগত মানুষের অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্যের অধিকার, রাজনৈতিক বন্দির নিঃশর্ত মুক্তি, মুসলিম সন্ত্রাসবাদী নিয়ে সংগঠনের অবস্থান ও শুধুমাত্র প্রতিক্রিয়া মূলক কাজের বাইরে নির্দিষ্ট বিষয়ে পরিকল্পনামাফিক কাজ, ইত্যাদি দিকগুলিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে। সংগঠনের মধ্যে থাকা বহুস্বরত্বকে মর্যাদা দেওয়ার নীতিই সম্মেলন পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে।

কৃষ্ণনগর সম্মেলনের সাংগঠনিক সফলতা

প্রশ্ন হল, কৃষ্ণনগরে ২০২২-এ অনুষ্ঠিত গত ২৮ তম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন কি গঠনতন্ত্রে অনুসৃত উক্ত নীতির বাইরে একবজ্ঞাভাবে পরিচালিত হয়েছিল? দেখা যাক, আমাদের গঠনতন্ত্রে কী আছে?

১৬ নম্বর ধারার, ক) ''নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরের সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।''

খ) ''সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বা কার্যকরী সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ একান্ত অসম্ভব হলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।''

গ) ''সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে বহুস্বরত্বকে মর্যাদা দেওয়ার নীতি অনুসৃত হবে।''

২০২২ সালে, কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত ২৮ তম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে কি উক্ত নীতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আন্তরিকতার অভাব দেখা গিয়েছিল? যাঁরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন, সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সভাপতিমন্ডলী এবং স্টিয়ারিং কমিটি আপ্রাণ আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা সত্ত্বেও যখন কোনও রকমেই সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না, তখন সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলী নির্বাচিত হয়। হ্যাঁ, এটা সত্যি মাঝখানে অনেক অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত সংগঠনের নীতিকে মর্যাদা দিয়েই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এটাই যে, গোটা গঠনতন্ত্র চিরুনি তল্লাশি করলেও সহমত শব্দটি খুঁজে পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, এর স্পিরিটটা খুঁজে পাওয়া যাবে। কৃষ্ণনগর সম্মেলনে বিশেষ পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত যদি সংগঠনের গঠনতন্ত্রের নীতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহলে তার মানে কী এটাই হয় যে, এপিডিআর তার ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারেনি! না-কী এইটা হয় যে, সম্মেলনের সভাপতি মন্ডলী ও স্টিয়ারিং কমিটি গঠনতন্ত্রের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী সংগঠনকে সচল রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। ব্যর্থ হওয়া-তো দূরস্থান অত্যন্ত অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যেও সাংগঠনিক সিদ্ধান্তকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কৃষ্ণনগর সম্মেলন সফল হয়েছে। আমাদের ঠিক করতে হবে, সংগঠনের গঠনতন্ত্রকে, সংগঠনের আপামর সদস্যর মতামতকে, সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টাকে আমরা মর্যাদা দেব, না-কী একটা মনোগত চিন্তা সংগঠনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে সংগঠনের কৃষ্ণনগর সম্মেলনকে ব্যর্থ প্রমাণ করতে ব্যস্ত থাকবো!

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে কি আমরা বিপদ হিসেবে চিহ্নিত করি?

২০২২ সালের কৃষ্ণনগর সম্মেলনের আগে থেকে সমগ্র সংগঠনের অন্দরে একটি শব্দ হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। শব্দটি হল, 'সহমত'। অথচ ,গঠনতন্ত্রে নির্দিষ্টভাবে এই শব্দটি কোথাও নেই। গঠনতন্ত্রের ১৬'র 'ক'-'খ'-'গ' কোনও ধারাতেই 'সহমত' শব্দের কোনও উল্লেখ নেই। কিন্তু স্পিরিটটা বোঝা যায় এবং সেটা খুব স্বাভাবিকভাবেই লেখা আছে। 'সহমত', 'সহমত করে একটা বিমূর্ত অস্বাভাবিকত্ব সংগঠনের ঘাড়ের ওপর যে-ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়, সে-ভাবে নেই। গঠনতন্ত্রের ১৬'র 'খ' ধারা দেখুন, ''সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বা কার্যকরী সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ একান্ত অসম্ভব হলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।'' এটা শুধুমাত্র এপিডিআর নয় যে-কোনও সংগঠনের ক্ষেত্রে একটা স্বাভাবিক চিন্তা। 'সহমত' শব্দটি বিভিন্নভাবে সংগঠনের ওপর আরোপ করা হচ্ছে, কিন্তু ঘটনা হল, প্রয়োগের প্রশ্নে সংগঠন শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত এর স্পিরিটটাই নিয়েছে, যেটা সব গণতান্ত্রিক সংগঠনই নেয় বা নেওয়া উচিত। কারণ, আমাদের সংগঠনকে

বাস্তব পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, অন্য সব গণতান্ত্রিক সংগঠনের মতোই। তাই আমাদের সংগঠন স্ব-ঘোষিতভাবে কখনোই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি বা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে বিপদ হিসেবে চিহ্নিত করে নিজেদেরকে বিপরীতে দাঁড় করানোর মরিয়া প্রচেষ্টা কখনোই করেনি। বারংবার 'সহমতের ভিত্তিতে', 'সহমতের ভিত্তিতে' বলে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে অধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিপদ হিসেবে চিহ্নিত করাটা মোটেই সবাইকে নিয়ে চলার পদ্ধতি নয়। আসলে এটা নিজেদেরকে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা অবাস্তব কল্পনাপ্রসূত ব্যক্তি কেন্দ্রিক চিন্তাকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেওয়া। যাঁরা গঠনতন্ত্রকে ২০১৩ সালে হুগলির সভায় সংশোধন করেছিলেন তাঁরা এটা জানতেন। আজকে বোধহয়, তাঁদেরই মধ্যে অনেকেই বিস্মৃত হয়েছেন। আসলে, এপিডিআর-এর মত সংগঠনে অনেক ধরণের চিন্তার মানুষ আছে। তাদের ভাবনাচিন্তা জানানোর একটা পরিসর থাকা দরকার। আবার যেহেতু বহু ধরণের চিন্তা আছে তাই চিন্তার সংঘাতও থাকবে, কিন্তু এই সংঘাত দেখে ঘাবড়ে গিয়ে 'সহমত-এর ভূত দেখা ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে অগ্রাহ্য করে নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বিপরীতে দাঁড় করানোর যে মরিয়া প্রচেষ্টা, তা' সংগঠনের মধ্যে নানা ধরনের বিভ্রান্তি তৈরি করে যা সংগঠনের মধ্যে নীতির প্রশ্নে ঐক্য অর্জন করতে ক্রমশ বাধা দান করে।

প্রশ্ন, ফান্ডেড এনজিও

এনজিওর সাথে কাজের প্রশ্নে আমাদের একটা সিদ্ধান্ত আছে। গঠনতন্ত্রের ১৭'র 'খ' ধারা। লেখা আছে, ''সমিতি কোনও দেশি-বিদেশি সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক অর্থ সাহায্য গ্রহণ করবে না, বা এই ধরণের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করে যে-সব সংস্থা; সাধারণভাবে যাদের ফান্ডেড এনজিও বলা হয় তাদের সঙ্গে যৌথ কর্মসূচিতে যাবে না। বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সিদ্ধান্তক্রমে এই ধরনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আহবানে সাড়া দেওয়া যেতে পারে। শাখা বা জেলা কমিটিগুলিও সংশ্লিষ্ট কার্যকরী সমিতির অনুমোদন ক্রমে এ-ধরনের যৌথ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আহবানে সাড়া দিতে পারে। এরকম সমস্ত সিদ্ধান্তই পরবর্তী কাউন্সিল সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।'' তাহলে এখানে তো পরিষ্কার হয়ে গেল কোনও শাখা স্বাধীনভাবে তার কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে বিশেষ ক্ষেত্রে ফান্ডেড এনজিওর সাথে কর্মসূচি নিতে পারে, কিন্তু সেটা অবশ্যই হায়ার কমিটি অর্থাৎ কাউন্সিলে অনুমোদন নিতে হবে। তাহলে আপনার গঠনতন্ত্রই আপনাকে একটা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সাথে যুক্ত করে দিচ্ছে। তাও খুঁচিয়ে এই বিষয়টা নিয়ে মাঝে মাঝেই বিতর্ক হিসেবে উপস্থাপন করা সংগঠনের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি তৈরি করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রশ্ন, বন্দিমুক্তি আন্দোলন

আমাদের গঠনতন্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য'র ৯ নম্বর পয়েন্টে লেখা আছে, ''সমস্ত রাজনৈতিকবন্দির নিঃশর্ত মুক্তি এবং যে-কোনও ধরনের বন্দিশালায় থাকাকালীন তাদের রাজনৈতিক বন্দির মর্যাদার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলা সমিতির কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ।'' তার মানে, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি নিয়ে আমরা আন্দোলন গড়ে তুলতে পারি। আমাদের সমিতি ১৯৭২ সাল থেকেই রাজনৈতিক বন্দি মুক্তি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এর অজস্র উদাহরণ আমাদের কাছে আছে। কিছুদিন আগে আমাদেরই প্রকাশিত বই 'শুরুর দিনগুলি' বেশ কিছু ছত্রে এ-বিষয়টি দেখিয়েছে। রাজনৈতিক বন্দি মুক্তির আন্দোলন মানে নিশ্চয়ই শুধুমাত্র রাস্তার আন্দোলনই নয়, আইনের দরজায় করাঘাতও বটে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালে তৃণমূল সরকার আসার পরও রাজনৈতিক বন্দির নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে আমরা পথে নেমেছিলাম। ''শিশু সরকার, এখন নিঃশর্ত রাজনৈতিক বন্দির দাবিতে পথে নেমে রাজ্য সরকারকে চাপ দেওয়া যাবে না।''—এই ধরনের শিশুসুলভ চেতনার বিরুদ্ধে যে বিতর্ক হয়েছিল, তাতে সংগঠন রাজনৈতিক বন্দির নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে পথে নামার পক্ষেই ছিল। কিন্তু অযাচিত বিতর্ক তৈরি করে বন্দিমুক্তি আন্দোলনের মধ্যে ফাটল ধরানো হল। রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি আন্দোলনের যে স্রোত তৈরি হয়েছিল সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম ও লালগড়কে ঘিরে, তাতে রাজ্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টিকারী বড় আন্দোলন হতে পারত। কিন্তু রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি আন্দোলনের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে পরিকল্পনামাফিক করতে দেওয়া হল না।

আমাদের সংগঠনের ব্যাপক অংশ কিন্তু বন্দিমুক্তি আন্দোলনের অভিজ্ঞতা সারসংকলন করে অবিচল থাকলো নিঃশর্ত রাজনৈতিক বন্দিমুক্তির দাবিতে, আন্দোলনের পক্ষে। আপনারা যদি ভুলে না-যান, পরবর্তীতে যুগ্ম আহ্বায়ক রেখে রাজনৈতিক বন্দি মুক্তির যৌথ উদ্যোগ তৈরি হলো। এটা তৈরি হল শুধুমাত্র রাস্তার আন্দোলনের জন্য নয়, আইনি লড়াই করবার জন্যও। কিন্তু কিছুদিন চলার পরই উদ্যোগটি নানা

অবাঞ্ছিত হই হট্টগোলে হারিয়ে গেল বা বলা ভালো, উদ্যোগটিকে পেছনের সারিতে সরিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু একটা বিষয়ে সংগঠনের মধ্যে সাধারণ সমঝোতা আছে যে রাজনৈতিক বন্দির নিঃশর্ত মুক্তি প্রশ্নে সংগঠন রাস্তার আন্দোলন গড়ে তোলা ও আইনি দরজায় করাঘাত, দু'টো প্রক্রিয়াই চলবে। যদিও নানা বাঁক পেরিয়ে বর্তমানে মেদিনীপুর আদালতের শিলদা মামলায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরায়ণ রায় রাজনৈতিক বন্দির নিঃশর্ত মুক্তির প্রশ্নে রাস্তার আন্দোলন ও আইনের দরজায় করাঘাত দু'টোরই ত্বরান্বিত হওয়ার সম্ভাবনাময় পরিস্থিতি আমাদের সামনে এসেছে। এই কথা সত্যি, নাগরিক অধিকার আন্দোলনে রাষ্ট্রের চাপও ক্রমাগত বাড়ছে। কিন্তু তাই বলে রাজনৈতিক বন্দির নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে রাস্তার আন্দোলন গড়ে তোলা ও আইনি লড়াই করা আমাদের সমিতি কোনোভাবেই বাতিল করতে পারে না। এটা হবে রাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণের নামান্তর। সংগঠন কোনও রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির দায় এড়িয়ে যেতে পারে না। তাই রাজনৈতিক বন্দিরা চাইলে আইনের দরজায় করাঘাত করার বিষয়ে নিজেদের দায় এড়িয়ে যাওয়ার কোনও চিন্তাই রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি প্রশ্নে আমাদের সংগঠন কোনোদিন প্রশ্রয় দেয়নি, আজও দেবে না।

জীবন-জীবিকার প্রশ্নে গোষ্ঠী বা সমষ্টিগত মানুষের অধিকার আন্দোলন

গঠনতন্ত্রের ছত্রে-ছত্রে সংগঠনের অধিকার আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নে নির্দিষ্ট নির্দেশ রয়েছে। গঠনতন্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর ৫ নম্বর পয়েন্টে লেখা আছে, ''জল জমি জঙ্গলের অধিকার ও সুস্থ পরিবেশের জন্য মানুষের লড়াইকে সমিতি গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা আন্দোলনের অংশ বলে মনে করে এবং সাধ্যমত এইসব আন্দোলনের সমর্থনে সংহতি আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার করে।''—তার মানে সমিতি জল জঙ্গল জমির অধিকার প্রশ্নে আন্দোলন বা সংহতি আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে। এটা নতুন নয়, আমরা আগেও করেছি। এরই ভিত্তিতে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম আন্দোলনে আমাদের ভূমিকা ছিল সুস্পষ্ট। তাছাড়াও সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, লালগড় আন্দোলনের সংহতিতে নিজ নিজ এলাকায় আন্দোলন আমরাই গড়ে তুলেছি। আপনারা ভুলে যাবেন না, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম বা লালগড়ের ক্ষেত্রে গোষ্ঠী বা সমষ্টিগত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, জীবন-জীবিকার অধিকার নির্দিষ্টভাবে জড়িয়ে আছে। আর এই জীবন-জীবিকার রক্ষা বা অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে আমাদের সংগঠনের নেতৃত্বেই গড়ে উঠেছে, সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের অধিকার আন্দোলন। গড়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদের ফারাক্কায় কৃষকের অসম্মতিতে কর্পোরেট আদানির ১০০০ বিঘা আম-লিচু বাগানের ওপর সাড়ে তিন লক্ষ ভোল্টের তার নিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে ফলচাষী আন্দোলন।

উত্তরবঙ্গ ও মুর্শিদাবাদে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসরত এক ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ওপর বিএসএফের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এলাকার মানুষ আন্দোলনরত আমাদেরই সংগঠনের নেতৃত্বে। মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে গঙ্গা ভাঙনে সর্বস্ব হারানো নদী তীরবর্তী এক একটা জনগোষ্ঠীর সম্পূর্ণ পুনর্বাসনের দাবিতে এলাকার জনসাধারণ আজও আন্দোলনরত, আমাদের সংগঠনের উদ্যোগে। ফলে শ্রমজীবী মানুষের আধিক্য সংগঠনে বাড়ছে। তাই আন্দোলন গড়ে তোলা আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। এলাকা সিঙ্গুরের বদলে পরিবর্তিত হয়ে সুন্দরবন। নন্দীগ্রামের বদলে পরিবর্তিত হয়ে মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা অথবা ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত। পরিবর্তিত হল এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠী বা এক সমষ্টি থেকে অন্য সমষ্টি বা কৃষকের জমির ওপর অধিকার থেকে মৎস্যজীবীর জলের ওপর অধিকার। পরিবর্তিত হল শোষনের চেহারা, অধিকারহীনতা মানুষের যন্ত্রণার চেহারা। তাই আমাদের সমিতি কি আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে; এই নিয়ে বিতর্ক আজ তর্কাতীত। হাঁড়ির কাঁকড়ার মত অধিকার আন্দোলনকে পেছন থেকে না-টেনে, তাকে আরও কী করে সুচারু রূপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তাই নিয়ে বিতর্ক সংগঠনকে স্বাস্থ্যকর করে তোলে। সংগঠনের সদস্যদেরও আরও সৃজনশীল করে তোলে।

ভারতের সংবিধান ও আমাদের অধিকার আন্দোলন

গঠনতন্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য'র এক নম্বর পয়েন্টের শেষ চারটি লাইনে আছে, ''ভারতের সংবিধানের যেসব ধারা মানুষের অধিকারকে খর্ব করে, সেগুলিকে বাতিল করার এবং যেসব অধিকার এখনও সংবিধানে স্বীকৃত নয়, সেগুলির স্বীকৃতি অর্জনের জন্য জনমত ও আন্দোলন গড়ে তুলতে সমিতি অঙ্গীকারবদ্ধ।'' তাহলে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সংবিধানের যেসব ধারা মানুষের অধিকারকে খর্ব করে, তা বাতিলের দাবিতে আমরা আন্দোলন গড়ে তুলতে পারি। তার মানে সংবিধানে স্বীকৃত সমস্ত কালাকানুন বাতিলের দাবিতে আমরা আন্দোলন গড়ে তুলতে পারি। এটাই আমরা জানি, এটাই

আমাদের এতদিন জানানো হয়েছে। কিন্তু যেটা জানানো হয়নি, আমরা প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে শিখেছি, জনসাধারণের অধিকারবোধ থেকে শিখেছি। নাগরিকত্ব সম্পর্কিত আইন এনআরসি, সিএএ নাগরিক অধিকারকে কেড়ে নেয়, তাই তার বাতিলের দাবিতেও আমরাই আন্দোলন গড়ে তুলতে পারি। এরকম অনেক আইন আছে সংবিধানে, যেগুলো বাতিলের দাবিতে এপিডিআর নিজেই আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে। আর আন্দোলন মানেই হচ্ছে জনসাধারণের অংশগ্রহণ। আর জনসাধারণের অংশগ্রহণকে কোন সীমা দিয়েই আটকানো যায় না। এর মানেই হচ্ছে, গণজমায়েত, গণআন্দোলনের সম্ভাবনা।

এমন অনেক অধিকার আছে যেগুলো ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত নয়, সেই অধিকারগুলো স্বীকৃতির জন্যও আমরা আন্দোলন গড়ে তুলতে পারি। কৃষকের জমির ওপর অধিকার, ফসলের ওপর অধিকার, মৎস্যজীবীর জলের ওপর অধিকার, ভূমিহীনদের ভূমি বন্টন, এরকম অনেক অধিকার আছে যার সাংবিধানিক স্বীকৃতির জন্য আমরা আন্দোলন গড়ে তুলতে পারি। আমাদের সংগঠনের গঠনতন্ত্র এই অধিকার সংগঠনের আপামর সদস্যদের দিয়েছে। আসলে অধিকার আন্দোলন হয় অধিকার চেতনা দিয়ে, অধিকারবোধ দিয়ে। শুধুমাত্র কয়েকটি অধিকার ছাড়া আর অন্য অধিকার নিয়ে আন্দোলন করা যাবে না, এই ধরনের সীমাবদ্ধ চিন্তা অবশ্যই অধিকার আন্দোলনকারীদের হতে পারে না। আসলে অধিকার মাত্রই সেটা সময়ের সাথে সাথে সম্প্রসারিত হয়। তার বিস্তৃতি ঘটে।

প্রশ্ন, বিশ্বায়ন

গত শতাব্দীর ৯০ এর দশক থেকে বিশ্বায়নের নামে সারা পৃথিবীতে যে একমাত্রিক নয়া উদারনৈতিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হল তাতে নাগরিকদের সব ধরনের গণতান্ত্রিক অধিকার, মানবাধিকার, রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকার খর্ব করার এক নতুন অধ্যায় শুরু হলো। জনসাধারণের প্রত্যেকটি অধিকার একে অপরের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে একই সুতোতে গাঁথা হয়ে গেল। রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, শোষণ বঞ্চনার মাত্রারও পরিবর্তন হল। অপরদিকে অধিকার আন্দোলনে নানা দিক থেকে রাষ্ট্রের দ্বারা নিপীড়িত জনতার যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও ক্রমাগত বাড়তে থাকলো। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার লড়াইগুলি ক্রমাগত এক জায়গায় এসে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নকে চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে দিল। এই অবস্থায় আমাদের সংগঠনও চুপ করে বসে ছিল না। অধিকার আন্দোলনের গতিমুখ পরিবর্তনকে লক্ষ্য করে গঠনতন্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ১৫ নম্বর পয়েন্টে লেখা হলো, ‘‘সমিতি এই আক্রমণের বিরুদ্ধে অধিকার গুলি রক্ষার জন্য সাধ্য সামর্থ মত জনমত গড়ে তোলা ও আন্দোলন সংগঠিত করা নিজের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করে।’’ তাই বিশ্বায়নের যুগে অধিকার আন্দোলন সংগঠিত করাই আমাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলেই নির্দেশ করেছে সমিতির গঠনতন্ত্র। ফলে এই গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলন সংগঠিত করতে গিয়ে যদি কোথাও আটকে যাই, তাহলে সেখান থেকে সংগঠনকে বের করে আরও গতিশীল করার জন্য আলোচনা বিতর্ক করতেই পারি। কিন্তু মাঠে ময়দানে অধিকার আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ ব্যতিরেকে ঘরে বসে শুধুমাত্র খোলামেলা আলোচনা বা বিতর্কের নামে ‘মানবাধিকার’ এক বিশেষ প্রজাতির জীব হিসেবে প্রতিপন্ন করে নিজেদের মনোগত পাণ্ডিত্য দেখাতেই পারি, কিন্তু তা’তে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম একচুলও এগোবে না।

করোনা সময়কালে লকডাউন ঘোষণা আসলে আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির ব্যাপক সংকটের একটা চরমতম ক্রুর ও হিংস্র বহিঃপ্রকাশ। লগ্নিপুঁজির অতি উৎপাদন-জনিত সংকট থেকে বাঁচার উপায় হিসাবে লকডাউন ঘোষণা। করোনা ভাইরাসের পেছনে না-ছুটে, মানুষের জীবন-জীবিকা হরণকারী লকডাউনের উক্ত প্রত্যেকটি জনবিরোধী প্রকাশের বিরুদ্ধে রাস্তায় থাকার সিদ্ধান্ত নিল সংগঠনের একটা অংশ। তাঁদের হাতিয়ার হল অধিকার চেতনা বা অধিকারবোধ। তাঁদের হাতিয়ার হল গঠনতন্ত্রে জীবন-জীবিকার অধিকারের পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলার নির্দিষ্ট নির্দেশিকা। সংগঠনের সচলতাকে আরও গতিশীল করতে আলোচনা হতেই পারে, কিন্তু আলোচনা যদি ম্যাগ্নিফ্লাইং গ্লাস হাতে খুঁত খোঁজার জন্য হয়, সংগঠনের গতিশীলতাকে পেছন থেকে টেনে ধরার জন্য হয়, তাহলে মুশকিল।

নির্বাচনী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ও এপিডিআর

আমাদের সংগঠনের গঠনতন্ত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সাথে এপিডিআর জুড়বে, কী জুড়বে না, এই প্রশ্নে কিছুই লেখা নেই। তাই খুব স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেকটি সরকারী রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে নাগরিক আন্দোলনের কী অবস্থান হবে, সেটা নিয়ে সংগঠন নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। আমাদের সংগঠনের মধ্যেও এই নিয়ে নানারকম বিতর্ক চলে। কিন্তু এপিডিআরের সংগঠন হিসাবে কখনোই

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। এটাই সংগঠনের বেশিরভাগ সদস্যর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল প্রশ্নে বোঝাপড়া। নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের ওপর যে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নেমেছিল, আমরা তার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। আবার আমরা নকশালবাড়িকে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে রক্তস্নাত হিসাবেই দেখিনি, আমরা দেখি, শোষিত বঞ্চিত দরিদ্র নিরন্ন কৃষকের জমির অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই হিসাবে। একই ঘটনা সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম লালগড়ের প্রশ্নেও। আমরা সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের প্রশ্নেও টাটা বা সালেমের মত কর্পোরেটের কৃষকের জমির অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে। তার পক্ষে আমরা আন্দোলনও সংগঠিত করেছি। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের পক্ষে নিজে-নিজ এলাকায় সংহতিমূলক আন্দোলনও গড়ে তুলেছি। কিন্তু সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামকে ঘিরে যে নির্বাচনী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের আহ্বান রাখা হয়েছিল, আমরা নীতিগত প্রশ্নেই তাতে ছিলাম না। লালগড়ের ক্ষেত্রেও ছিতামনি মুর্মু'র চোখ উপড়ে ফেলার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল আমরা অধিকারের প্রশ্নে সেই সংগ্রামের পক্ষেও দাঁড়িয়েছিলাম। এলাকায় এলাকায় সংহতিমূলক আন্দোলনও গড়ে তুলি। কিন্তু এই আন্দোলনের অনেকেই যখন ২০১১ সালের নির্বাচনী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সাথে জুড়ে গেল, এপিডিআর সংগঠন হিসাবে কখনোই এই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সাথে জোড়েনি। এটা এখনো পর্যন্ত সংগঠনের মোটামুটি একটা নীতিগত অবস্থান। তবে, ক্ষমতায় আসার পর যে দলের পক্ষে আমরা সামিল হলাম, তারা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাবে বা চালাতে পারে, তাই আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে কোন রাজনৈতিক দলের হয়ে ওকালতি করবো না, এটা আমাদের কখনোই নীতিগত বা মূল চিন্তা নয়। রাস্তায় দুর্ঘটনা হয়, তাই বলে কি আমরা রাস্তায় যাওয়া বন্ধ করে দিই? আগে থেকেই অনুমানগতভাবে কোন কিছুকে ধরে নেওয়া কখনোই কোন সংগঠনের বস্তুগত ভিত্তি হতে পারেনা। আসলে সরকারী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে আমাদের না-যাওয়া, এটা অধিকার আন্দোলনের নীতির সাথে জড়িয়ে। দেখুন, বন্দুকের নলই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। এই সত্যটা সকলেরই জানা। তাই, যারা ভোটের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে চাইছে বা যারা ভোটের বাইরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে চাইছে প্রত্যেকেই এটা বিশ্বাস করে এবং জানে। কেউ স্পষ্ট করে সামনে বিষয়টি রেখেই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের যুদ্ধে সামিল হয়, আর কেউ সামনে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা দখলের বিষয়টি রেখে, পেছন থেকে বন্দুকের নলকে পরিচালিত করে। রাষ্ট্রও ভোট পরিচালিত করে বন্দুকের নলের ডগায়। সে কেন্দ্রীয় বাহিনী বা পুলিশ দিয়ে হোক বা সংসদীয় শাসক অথবা বিরোধী দলের গুন্ডাবাহিনী দিয়েই হোক। আসলে বন্দুকের নলের ডগায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন বা শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন, দু'টোই সোনার পাথরবাটি। আগে সংগঠনের মধ্যে এটা প্রায়সই আলোচনা হতো যে, রাষ্ট্র যতদিন থাকবে নিপীড়নকারী বনাম নিপীড়িতর সংঘাত থাকবে। ফলে, সংগঠন হিসাবে এপিডিআর এই রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় নীতিগতভাবেই নির্বাচনী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল বা সরকার পরিবর্তনের সাথে নেই।

ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ ও আমাদের সংগঠন

ফ্যাসিবাদ মূলত একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ। ফ্যাসিবাদ শব্দটা যখন আমরা বিভিন্ন জায়গায় চর্চার মধ্যে রাখছি, তার মানে আমরা মূলত রাজনৈতিক আলোচনার মধ্যে ঢুকছি। লগ্নিপুঁজি তার তীব্র সংকট থেকে বাঁচতে যে মরিয়া প্রয়াস নেয় তার নাম ফ্যাসিবাদ। সমস্ত নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর চলে চরম দমন-পীড়ন। দেশে দেশে তৈরি হয় অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক নৈরাজ্যবাদ। আর এই নৈরাজ্যবাদ থেকে বাঁচতে লগ্নিপুঁজি হাত মেলায়, রাষ্ট্রের সব থেকে পশ্চাৎপদ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাথে। আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সংকটকে মোকাবিলা করতে না পেরে লগ্নিপুঁজি সমাজের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদ ছড়িয়ে নিজেদের একটি ভিত্তি তৈরি করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। দেশের মানুষের জীবনের মৌলিক বিষয় যেমন রুটি, রুজি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সমস্ত বেঁচে থাকার সুস্থ পরিবেশের অধিকার থেকে চোখ সরিয়ে শুধুমাত্র পররাষ্ট্রনীতি বা যুদ্ধের বিষয়গুলি জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দেয়। বিরোধী কণ্ঠস্বরকে রোধ করতে হয় বিচারের নামে প্রহসন করে জেলে পাঠায় নয়তো হত্যা করে। জনসাধারণকে ক্রমাগত ব্যতিব্যস্ত করে রাখতে দেশে দেশে ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি করে। ফলে কোনও-না-কোনও ধর্ম বা জাতির ওপর পা রেখে অন্য কোনও ধর্ম বা জাতিকে আক্রমণ করে। নিজেদেরই শ্বাস নেওয়ার জন্য নিজেদের হাতে তৈরি পার্লামেন্টারী সিস্টেম ও কোর্টকেও করা হয় কুক্ষিগত। এই সমস্ত অবস্থাটাই একসাথে মিলে হয় ফ্যাসিবাদ। এটাই ছিল তৎকালীন হিটলার, মুসোলিনি বিরোধী সারা পৃথিবীর সর্বহারা ও গণতান্ত্রিক শক্তির ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে এক সাধারণ সমঝোতা।

আমাদের দেশটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে ধর্মের

নামে ভাগ হল। জনসাধারণ চেয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে স্বাধীনতার অধিকার। পেলো, দেশভাগ। ভারত রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে ঢুকে গেল ধর্মীয় ভিত্তি। লুট, মার, খুন, ধর্ষণের মধ্যে দিয়ে তৈরি হওয়া ভারত রাষ্ট্রের পুনর্গঠনে চলল লগ্নিপুঁজির ব্যাপক বিনিয়োগ। সে পুঁজির অনুপ্রবেশের দ্বার উন্মোচন করেছে, প্রয়োজনে ধর্মীয় বিভাজনের তাস খেলেছে। বিরোধী কণ্ঠস্বরকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে গারদের পেছনে। চলেছে সংঘর্ষের নামে হত্যা। তাই ভারত রাষ্ট্রের কাঠামোর সাথে ফ্যাসিবাদ জুড়ে গেছে বহু বছর আগে থেকেই।

ভারত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী কোন সরকারই তাই জনসাধারণের ওপর ফ্যাসিস্ট আক্রমণ থেকে বিরত হয়নি। গত শতাব্দীর ৯০ দশকে বিশ্বায়নের পর ফ্যাসিবাদের দাপট ভারতে আরও বেড়েছে। ক্রমাগত কর্পোরেটে পুঁজির দেশের সম্পদ লুট, রামের নামে বাবরি মসজিদ ধ্বংস অর্থাৎ এক ধর্মের ওপর পা রেখে অপর ধর্মকে আক্রমণ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের নামে দলিত - আদিবাসীর ওপর ভয়ানক নির্যাতন, ভারতীয় ফ্যাসিবাদকে আরও নির্দিষ্ট করেছে। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই হিন্দু ফ্যাসিবাদ আরও সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিচার ব্যবস্থা কুক্ষিগত করার মরিয়া প্রচেষ্টা চলছে। কংগ্রেস সরকার জনবিরোধী যে আইনগুলো তৈরি করেছিল বিজেপি সরকার বর্তমানে সেই আইন গুলোকে আরও কঠোরভাবে প্রয়োগ করছে। মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মাচরণ করার অধিকার ক্রমাগত কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। একাধারে মুসলিম প্রতিবাদী যুবকদের প্রতিনিয়ত কালাকানুন ইউএপিএ আইন দিয়ে মুসলিম সন্ত্রাসবাদী প্রমাণে ব্যস্ত; অপরদিকে কর্পোরেট লুটের বিরুদ্ধে জল জঙ্গল জমির অধিকারের জন্য যারা লড়াই করছে তাদেরকে আকাশ পথে বোমা মেরে অথবা ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা করা হচ্ছে। সমস্ত সংসদীয় রাজনৈতিক দল যারা ক্ষমতায় আছে বা যারা বিরোধী আছে প্রত্যেকেই লগ্নিপুঁজির দাসত্ব করছে।

তাই এই অবস্থায় নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে বিজেপি সরকারকে পরিবর্তন করে যারা আসতে পারে, তারা সকলেই নিজ নিজ রাজ্যে ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট তৎপর। তাই ‘নো ভোট টু বিজেপি’ বা ‘ডিফিড বিজেপি’ স্লোগানকে সামনে রেখে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা কর্মীদের ফ্যাসিবাদ বিরোধী কোন মঞ্চেই সামিল হওয়া মানে আসলে নির্বাচনী ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার নিজ বাসনাকে পূর্ণ করা। ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করা নয়। তাই আসুন, সংগঠন হিসাবে আমরা ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের প্রত্যেকটি প্রকাশের বিরুদ্ধে সাধ্যমত রুখে দাঁড়াই, আন্দোলন সংগঠিত করি। সাথে-সাথে সরকার গঠনে বা পরিবর্তনে নির্বাচনী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে সংগঠনের না-থাকার নীতিকে আরও দৃঢ় করি।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রধান নিয়ন্ত্রক সংস্থা আরবিআই কি নিঃস্ব হওয়ার পথে?

বিজয় ঘোরপাড়ে

[বর্তমান সময়ে ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতি আমাদের দেশকে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে এনে ফেলেছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, যাকে এই দেশের অর্থনীতির ত্রাণকর্তা বলা হয়, সেও নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার পথে। আজ, আরবিআই-এর অবস্থা এমন যে, কোনও ব্যাঙ্ক আর্থিকভাবে ডুবে গেলে, আরবিআই তার কর্তব্য হিসাবে আর্থিকভাবে পাশে এসে দাঁড়াতে পারবে না। অ্যাকাউন্ট হোল্ডার বা আমানতকারীদের সঞ্চিত অর্থের নিরাপত্তা দিতে পারবে না। দেশে প্রতিদিন বেড়ে চলা মূল্যস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আরবিআই এবং সরকার তাদের দায়িত্ব পালনের কিছুই করতে পারবে না। গত এক দশকে কর্পোরেট, কোম্পানি, শিল্পপতিদের দেওয়া বিশাল ঋণের মাত্র ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ ফেরত এসেছে। বাকি ৬৫-৭০ শতাংশ অনাদায়ী থেকে গিয়েছে। সরকার আজ ব্যাংক বেসরকারিকরণের পথে হাঁটবার পরিকল্পনা নিয়েছে। এখন তাই বড় প্রশ্ন, ব্যাঙ্ক-রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং সরকার তাদের মৌলিক দায়িত্ব থেকে পালিয়ে গেলে দেশ ও দেশের অর্থনীতির কী হবে? কী হবে দেশের সাধারণ জনতার আর্থিক নিরাপত্তার! আজ ধর্ম, হিন্দু রাষ্ট্র, হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ, সংস্কৃতি, ইতিহাস বিকৃতির বিষয়গুলিকে সামনে এনে রাজনীতিবিদরা ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থনৈতিক অবস্থার এই চেহারা থেকে মানুষের দৃষ্টিকে আড়াল করতে সচেষ্ট। সে-কারণে দেশের একটা বড় অংশের নাগরিকদের উপলব্ধিতে অর্থনীতির এই বিপদ সংকেত ধরা পড়ছে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতিবিদ বিজয় ঘোরপাড়ে’র সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রাসঙ্গিক নিবন্ধের অনুবাদ কিছুটা পরিমার্জিত আকারে প্রকাশ করা হলো। — প্রদীপ বাগচী, অনুবাদক]

লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন সময়ে, কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় রিজার্ভ ব্যঙ্কের (আরবিআই) সঞ্চিত তহবিল থেকে ১.৬৫ লক্ষ কোটি টাকা তুলে নিয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশের এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কটির সঞ্চিত তহবিলের পরিমাণ ত্রিশ

হাজার কোটিতে নেমে এসেছে। এই পরিস্থিতি ইঙ্গিত দেয় যে কেবল দেশের ব্যাঙ্কগুলি শুধু নয়, ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রধান নিয়ন্ত্রক সংস্থা আরবিআইও দেউলিয়া হওয়ার পথে রয়েছে- এই ঘটনাটি কি একটি বিপজ্জনক প্রবণতা নয়? এখন প্রশ্ন কেন এবং কী-ভাবে এই অবস্থা হতে চলেছে? সাধারণ নাগরিকদের ভাবনায় আজ অবশ্য এই প্রশ্ন জাগছে না কারণ, তারা দেশের অর্থনীতির তুলনায় ধর্মের আলোচনাতেই বেশি মগ্ন। তারা হয়তো এটাও জানে না যে, ২০১৪ সালের আগে দেশের কোনও সরকারই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে সম্পূর্ণ 'উদ্বৃত্ত অর্থ অর্থাৎ মোট লভ্যাংশ' তুলে নেয়নি। এই উদ্বৃত্ত অর্থের কিছু অংশ লভ্যাংশ হিসেবে সরকার তুলে নিয়েছে। ২০১৮ সালে, যখন উর্জিত প্যাটেল আরবিআই-এর গভর্নর ছিলেন, সে সময় মোদী সরকার তাদের থেকে সম্পূর্ণ লভ্যাংশের টাকা দাবি করেছিলেন। তবে প্যাটেল আরবিআই-এর নিয়ম মেনে সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তার এই ভুমিকার পরিণতিতে তাকে গভর্নর পদ থেকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। এরপরে কেন্দ্রীয় সরকার আরবিআই-এর এক প্রাক্তন গভর্নর বিমল জালানের সভাপতিত্বে একটি ৬ সদস্যের কমিটি গঠন করে, সরকারের অভিপ্রায় পূরণের পথ পরিষ্কার করেন।

উক্ত ঘটনার পূর্বে, আরবিআই থেকে সরকারের লভ্যাংশ হিসাবে নেওয়া সর্বাধিক অর্থের পরিমাণ ছিল ৫০-৫৫হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধী আরবিআই-এর কাছে ৫০হাজার কোটির পরিবর্তে ৭০ হাজার কোটি টাকা চেয়েছিলেন, কিন্তু সে-সময় ব্যাঙ্ক স্পষ্টভাবে তাঁর সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সরকার তা' মেনেও নিয়েছিলেন। বর্তমান সরকার যে শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থেই আরবিআই পরিচালনার নিয়মে পরিবর্তন এনেছেন তাই নয়, বরং কর্পোরেট এবং বড় কোম্পানিগুলির জন্য ব্যাঙ্কিং আইনের ৩২৩ থেকে ৩২৭ ধারার পরিবর্তন করেছেন। তাদের কৃতকর্মগুলিকে বাধাহীন ভাবে কার্যকরী করতেই তারা এটা করেছে। বিগত ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে দেশের ৫০ হাজার কোম্পানি দেউলিয়া হয়েছে। ব্যাংকগুলোর পুরাতন ঋণ অতলে ডুবেছে, অন্যদিকে নতুন ঋণ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ৭০ হাজার নতুন কোম্পানি! এটাই এই সরকারের আর্থিকনীতি!

এ-সময়ে, যদি আরবিআই-এর প্রত্যাশিত ৭৪ হাজার কোটি টাকার মুনাফা না অর্জিত হয় এবং যা সঞ্চিত আছে তা' সরকার নিয়ে নেয়, তাহলে দেশের ডুবন্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বাঁচাবে কে? লক্ষ্মীবিলাস ব্যাঙ্কের উদাহরণ আমাদের সামনে আছে। এছাড়াও মনে রাখতে হবে; ইয়েস ব্যাঙ্ক; ডিএইচএলএফ এর কথা। লক্ষ্মীবিলাস ব্যাঙ্ককে সিঙ্গাপুরের একটি ব্যাঙ্কের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। অন্য দুটি ব্যাংকের অবস্থা এখনও খুবই খারাপ; এছাড়া এখন আরও দু'টি ব্যাঙ্ককে বেসরকারি -করণের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই সময়ে, কুতুব মিনার 'বিষ্ণু স্তম্ভ' না-কী জ্ঞানবাপীতে 'শিবলিঙ্গ' আছে এইসব বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার পরিবর্তে আমাদের সরকারের এই অর্থনৈতিক নীতি দেশকে কোথায় নিয়ে এনে ফেলেছে সেটা বেশি করে উপলব্ধি করা দরকার!

সংবিধানের বিধি মতে, মুদ্রাস্ফীতি টানা চার মাস বৃদ্ধি পেলে, সরকারের সে বিষয়ে আরবিআইকে সরাসরি প্রশ্ন করা উচিত। আরবিআই-এরও দায়িত্ব তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা হাজির করা। অথচ গত ছয় মাস ধরে মুদ্রাস্ফীতির সূচক বাড়ছে, সরকার কোনও প্রশ্ন করেনি এবং আরবিআইও তার কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি। এই বিষয়ে সংসদে আলোচনা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এই সরকার তা করেনি। বর্তমানের আরবিআই বোর্ড সরকার কর্তৃক নিযুক্ত, সুতরাং কার থেকেই বা এর জবাবদিহি চাওয়া হবে? সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ায় কারণে উর্জিত প্যাটেলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হল! এমন একটা উজ্জ্বল উদাহরণ সামনে থাকলে সরকারের বিরুদ্ধে কেই বা যাবে! উল্টোপথে সরকার নিযুক্ত বোর্ড সরকারের পদক্ষেপগুলিকে সমর্থন জুগিয়ে আজ আরবিআইকে এই অবস্থায় নিয়ে এনে দাঁড় করিয়েছে।

২০০৬ সাল থেকে ২০১৪ পর্যন্ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-এর আট বছরের সময়কালের সাথে ২০১৪ সাল থেকে ২০২২ অবধি মোদীর আট বছরের সময়কালের তুলনা করলে দেখা যাবে যে, মনমোহন সিংহের মেয়াদকালে সরকার আরবিআই এর থেকে মাত্র ১,০১,৬৭৯ কোটি টাকা নিয়েছিল। যেখানে মোদির আমলে এই টাকা নেওয়ার পরিমাণ ৫,৭৪,৯৭৬ কোটি! পাঁচগুণেরও বেশি! এই কাজকে 'ব্যবস্থার মাধ্যমে চালাকি করে দুর্নীতি' বলা ভুল হবে না। এ-বারে আপনি উপলব্ধি করুন প্রকৃতপক্ষে কারা আরবিআইকে দেউলিয়া করার পথে নিয়ে চলেছে। কারাই বা জনগণের ব্যাঙ্ক পরিসেবার অধিকারকে বিপন্ন করে তোলার দিকে পরিস্থিতিকে নিয়ে চলেছে।

মৎস্যজীবীদের মহা বিপদ

মিঠুন মন্ডল

রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছেন যে দুই মাস, ১৫ এপ্রিল থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত নদী সাগরে মাছ,কাঁকড়া ধরা বন্ধ থাকবে। এই দুই মাসে মৎস্যজীবীদের মাসে ৫০০০ হাজার মানে দুই মাসে ১০০০০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। আমরা জানি সুন্দরবন অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ মৎস্যজীবী প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সবাই সবার উপর নির্ভরশীল। ধরুন, মৎস্যজীবী নদীতে মাছ ধরে নিয়ে বাজারে আড়তদারের কাছে বিক্রি করছে আবার আড়তদার পাইকারিদারদের বিক্রি করছে তারা গাড়ি করে কলকাতা ও বিদেশে রপ্তানি করছে, মানে সবাই এই জল-জঙ্গল এর উপর নির্ভরশীল।

গতবছর কুলতলির পূর্বগুড়গুড়িয়ার গণেশ মন্ডল ডিঙ্গি নিয়ে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে গুরুতর আহত হয়েছে এখন সে ৭০ শতাংশ প্রতিবন্ধী। এখন পরিবার বাচাতে স্ত্রী পাশের নদীতে মীন সংগ্রহ করে সংসার চালায়। সারা সুন্দরবন লোকালয়ের মানুষ নদীতে মীন সংগ্রহ করে সংসার চালায়। লক্ষ-লক্ষ মহিলা, তারাও মৎসজীবী অথচ তাদের বিএলসি নেই। তাই তারা সারা বছর বিনা পাশে মীন ধরে। বনদপ্তরের অত্যাচার চোখ-মুখ বুঁজে সহ্য করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেন। এরা কিন্তু এই ১০০০০ হাজার টাকা সাহায্য পাবে না। আমরা জানি আনুমানিক সারা সুন্দরবনে ১৬০০ বিএলসি পাস আছে। একটি বিএলসিতে মোটামুটি গড়ে পাঁচ জন করে যেতে পারবে। আনুমানিক ৮০০০ জন যেতে পারবে। তাহলে বাকি লক্ষ, লক্ষ মৎস্যজীবীদের কী হবে? একসপ্তাহ আগে কুলতলির জর্জের হাটের কৃষ্ণপদ'দা বললেন, তাদের মধু সংগ্রহের জন্য এই বছর থেকে টাইগার মানে রিজার্ভ ফরেস্ট এর পাশ কুলতলি বিট অফিসে আর দেওয়া হবে না। গোসাবার মৎস্যজীবীদের এই সুযোগ সুবিধা মিলছে। এখানকার মৎস্বজীবীরা ব্রাত্য। উল্টে আরও কিছু লোকাল বন রিজার্ভ ফরেস্ট-এর আওতায় আনা হচ্ছে এর ফলে লোকালয়ের আরও কিছু জঙ্গল এলাকা তাদের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

যেটা বড় সমস্যা সেটা হল, মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার ফলে নতুন করে রাজ্য সরকার এর লোগো লাগানো একটি মৎস্যজীবী কার্ড দেওয়া হচ্ছে। বেরিয়েছে ফর্ম সেই ফর্মে প্রধানের শংসাপত্র দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। এখানেই চলছে দলীয় রাজনীতির খেলা! শাসক দল ছাড়া অন্য রাজনৈতিক দলের মৎস্যজীবীদের মিলছে না শংসাপত্র। পুরানো কেন্দ্রীয় সরকারের একটি মৎস্যজীবীদের কার্ড অনেকেরই ছিল কিন্তু তা জমা করলে মিলবে না এই ভাতা। নতুন কার্ড করতে হবে কিন্তু কী করে এত তাড়াতাড়ি ১৫ এপ্রিলের মধ্যে সমস্ত মৎস্যজীবীরা এই কার্ড পাবে! এমন হচ্ছে, আগে যাদের মৎস্যজীবী কার্ড ছিল মানে নদীতে যারা মাছ ধরত, এখন তাদের কেটাগরি ভাগের কারণে মৎস্যজীবী কার্ড না হয়ে অন্য কার্ড হচ্ছে। বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বাড়ছে, বাড়ছে হতাশা।

সুন্দরবন অঞ্চলে মৎস্যজীবীদের তিন ধরণের কার্ড দেওয়া হয়, যাকে বলা হয় বি এল সি (Boat license certificate)। ১) Marin sector (সামুদ্রিক ক্ষেত্র) ২) Brackish water sector (নোনা জলের মৎসচাষ) ৩) Fresh water sector (মিষ্টি জলের মৎসচাষ)

এখন সমস্যা হলো মিন ধরে যে মহিলারা তারা কি তাহলে মৎস্যজীবী কার্ড পাবেন না পেলে তারা কি দুই মাস নদিতে নামতে পারবে না? যাদের আগের মৎস্যজীবী কার্ড আছে তাদের পুরোনো কার্ড থাকলে অবশ্যই সামুদ্রিক ক্ষেত্র কার্ড দেওয়া হোক। আপাতত যতদিন তারা নতুন কার্ড পাবে পুরানো কার্ড জমা দিয়ে দু'মাসের ১০ হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার ব্যাবস্থা করা হোক। পুরানো যাদের মৎস্যজীবী কার্ড আছে তদের একজনও যেন সামুদ্রিক ক্ষেত্র-কার্ড থেকে বঞ্চিত না হয়। সমস্যা হচ্ছে, কিছু রাজনৈতিক নেতার অঙ্গুলি হেলনে প্রকৃত মৎস্যজীবী সামুদ্রিক ক্ষেত্র-কার্ড পাচ্ছে না মানে, অন্য কার্ড পেলে তারা সমুদ্র থেকে চিরদিনের মতো বঞ্চিত হবে। কারণ, সরকার নতুন করে কোনও বিএলসি পাস দিচ্ছে না। বিষয়টি ক্রমশ খুবই স্পষ্ট হচ্ছে, মতস্যজীবিদের উৎখাতের এর সময় ঘনিয়ে আসছে। ২ নং, ৩ নং কার্ড পেলে তারা নদীতে নামার অধিকার হারাবে, এমনিতেই বিএলসি আছে এমন অনেক লোক নদীতেই নামেই না। তারা বছরে ৭০ হাজার কোনও-কোনও সময়ে সুযোগ বুঝে ৯০০০০হাজার টাকায় ভাড়া দেয়। পাঁচ সাতজন মিলে ভাড়া নিয়ে সারাবছর মাছ কাঁকড়া ধরতে যায়, তার উপর নিষিদ্ধ জায়গায় যাওয়ার জন্য বছরে দুই চারবার বনদপ্তর জরিমানা করে। জরিমানা ৩ হাজার থেকে ২০ হাজার পর্যন্তও হয়। সুন্দরবন অঞ্চলে হাজার-হাজার অধিবাসী ডিঙ্গি নিয়ে মাছ ধরে, তাদের কী হবে! তারা কি এই ভাতা থেকে বঞ্চিত হবে? তাদের ও সামুদ্রিক ক্ষেত্রে কার্ড দেওয়া হোক তা না হলে সরকারের যে সদিচ্ছা তা কখনোই পূরণ হবে না।

মনে হয়, নদীর ছোট-ছোট মাছ, কাঁকড়া, বাঁচানোর সরকারের এই পন্থা অথৈজলে ডুবে যাবে। খিদে পেলে মৎস্যজীবীরা আইন ভাঙবে, আর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলে তারা আগ্রাসী হবে। এখানে বসতকরা মানুষ বাঘের সঙ্গে লড়াই করে ক্ষুধার অন্ন যোগাড় করে সংসার চালায়, আবার বাঁচিয়ে রাখে সুন্দরবন কারণ তাদের সহোযোগিতায় ছাড়া সুন্দরবন রক্ষা করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মৎসজীবীদের বাঁচাতেই হবে সরকারকে, সে-ভাবেই পরিকল্পনা সাজাতে হবে। সরকারের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত সুন্দরবন বাঁচানো-মানুষ বাঁচুনো। বাঁচুক পশুপাখি, আমাদের স্বপ্নের ম্যানগ্রোভ। সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি দ্রুত সমাধানের জন্য।

হাইকোর্টে এস এস সি র মামলায় ২৫৭৫৩ জনের চাকরি গেলো এই রায় রাজনীতি চালিত — এই রায় ন্যায়বিচারের মূলনীতির পরিপন্থী

সঞ্জীব আচার্য্য

এস এস সি-র নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে ২০১৬ সালের পুরো প্যানেলটাকে বাতিল করে সকলের (২৫৭৫৩ জন) নিয়োগ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এর সাথে যারা অবৈধভাবে নিয়োগ পেয়েছিলেন (প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও ওই প্যানেল থেকে, প্যানেলে নাম না থাকা সত্ত্বেও এবং সাদা খাতা জমা দিয়েও যারা চাকরি পেয়েছেন) এযাবৎকাল পাওয়া সমস্ত বেতন চার সপ্তাহের মধ্যে ফেরত দিতে হবে ১২ শতাংশ সুদসহ। এছাড়াও তদন্ত চালিয়ে যাওয়া, প্রয়োজনে অভিযুক্তদের হেফাজতে নেওয়া নির্বাচন শেষ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা নির্দেশ দিয়েছেন। যোগ্য প্রার্থী যারা চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়ে গত চার বছর ধরে অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের নাছোড়বান্দা লড়াই সমাজকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছে। সেই কারণে এই দুর্নীতির তদন্ত অত্যন্ত জরুরি ছিলো এবং প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি হওয়াটা এবং বঞ্চিতদের প্রাপ্য অধিকার ফিরে পাওয়াটা গণতন্ত্রের পক্ষে প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই রায় কি সত্যি সত্যিই গণতন্ত্রের পক্ষে গেলো, দুর্নীতিরোধের প্রবল আকাঙ্ক্ষা থেকেই কি এই রায় দেওয়া হলো? ন্যায়বিচারের মূলনীতিগুলি মেনে নিয়ে কি এই রায় দেওয়া হলো?

এই রায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে আদালতের নিরপেক্ষ উদ্যোগ নাকি রাজনৈতিক ভাবে চালিত হয়ে গেলো?

সারা দেশে দুর্নীতির ফুলঝুরি ফুটছে, মধ্য প্রদেশে ব্যাপম কেলেঙ্কারিতে বি জে পি সরকার যুক্ত এবং কোটি কোটি টাকার দুর্নীতিই শুধু নয়, চল্লিশ জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে কিন্তু সেই মামলায় অশ্বডিম্ব প্রসব হয়েছে, কর্ণাটকের বি জে পি নেতা খনি কেলেঙ্কারিতে কয়েক হাজার কোটি টাকার দুর্নীতিতে অভিযুক্ত কোনো বিচার নেই। পশ্চিমবঙ্গের সারদা দুর্নীতিতে কয়েক লক্ষ মানুষ সর্বস্বান্ত কত মানুষ আত্মহত্যা করেছেন কিন্তু ১২ বছর পরেও অভিযুক্তরা সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের কেউ কেউ তৃণমূল দল বদলে বি জে পি-তে গেছে তাই মামলায় পিছুটান পড়েছে। নারদা মামলারও একই পরিণতি। এই মামলা শুরু হয়েছিল বঞ্চিত যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের আবেদনে। এই রায়ে তাদের জন্য কোনও সুবাতাস নেই। সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা শেষ হতো ৮ ই মে। তার ১৫ দিন আগেই রায় বেরিয়ে গেলো এসএসসি র নিয়োগ মামলার। মূল চক্রান্তকারীদের একজনেরও শাস্তি ঘোষণা হয়নি। কিন্তু ওই প্যানেলে নিযুক্ত ২৫৭৫৩ জনেরই নিয়োগ বাতিল হয়েছে। সিবিআই এর রিপোর্টে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজারের মতো নিয়োগে রকমারি গরমিল ও বেনিয়ম হয়েছে আর বাকিদের সম্পর্কে কোনও বেনিয়মের অভিযোগ রিপোর্টে নেই। কোনও দোষ প্রমাণ হয়নি তবু প্রায় ২০০০০ এর জনের চাকরি বাতিল হলো তাড়াহুড়ো করে দেওয়া এই রায়ে। রায় বেরোবার আগেই বিরোধী নেতা বোমা ফাটার উল্লাস দেখিয়েছিলেন। এই মামলার বিচার শুরু এবং গতি পেয়েছিল যার হাতে সেই বিচারপতি অভিজিৎবাবু আজ বি জে পি-র নির্বাচনী প্রার্থী। তাই এই রায় ন্যায়বিচারের থেকেও অনেক বেশি রাজনীতি চালিত। এটা গণতন্ত্রের পক্ষে বিষম বিপদের।

যা রায় দেওয়া হলো সেটাও কি ন্যায়বিচারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলো?

এই রায়ে ২৫৭৫৩ জনের চাকরি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই প্যানেলে ২৫৭৫৩ জন যারা নিয়োগ পেয়েছেন তাদের সকলের প্রাথমিক যোগ্যতা আছে। কিন্তু নিয়োগ পাওয়ার জন্য সব বিভাগের প্রাপ্ত নম্বর মিলিয়ে মোট নম্বরের ভিত্তিতে যোগ্যতার একটা ক্রম তালিকা থেকে ক্রমানুসারে নেওয়ার

কথা। বিভিন্ন রকমের জালিয়াতি করে এই ক্রম তালিকা বিকৃত করা হয়েছে, তালিকার ক্রম না মেনে নিয়োগ হয়েছে, তালিকার বাইরে থেকে নিয়োগ হয়েছে। ৯-১০ এবং ১১-১২ শ্রেণীর শিক্ষক, গ্রুপ C এবং গ্রুপ ঙ্গ মোট চারটি ক্যাটাগরিতে নিয়োগ হয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম বহির্ভূত নিয়োগ ১০ শতাংশ এর কাছাকাছি। গ্রুপ D তে ৪৫ আর গ্রুপ C তে ৩০ শতাংশ-এর কাছাকাছি। আদালত তার পর্যবেক্ষণে এই নিযুক্তদের দু'ভাগে ভাগ করেছে। নিয়মবহির্ভূত এবং নিয়মমাফিক (valid)। আদালত রায় দিয়েছে যারা বেআইনীভাবে চাকরি পেয়েছে তাদের বেতন ফেরত দিতে হবে সুদসহ। কিন্তু সি বি আই এর রিপোর্টে যাদের বেনিয়মে চাকরি হয়েছে বলা হয়েছে তারা বেনিয়ম করার অপরাধে যুক্ত এমন কোনও প্রমাণ দেওয়া হয়নি। বেনিয়ম করেছে এস এস সি অথবা শিক্ষা দপ্তর অথবা শাসক দলের নেতা কর্মীরা। কিন্তু শাস্তি হবে শুধু এদের। এতদিনের বেতন ফেরত দিতে হবে। কাকে ফেরত দেবে? সেই সরকারকে যারা নিজেরাই এই দুর্নীতির সাথে যুক্ত। চমৎকার! এতদিন এরা স্কুলে কাজ করে বেতন পেয়েছেন। সেই টাকা কোন যুক্তিতে ফেরত নেওয়া যায়? তাহলে সরকারেরই লাভ হলো। নিজেরা দুর্নীতি করলো আর তারাই বিনা পয়সায় খাটিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলো। এটা ন্যায়বিচার!

যাদের বিরুদ্ধে বেনিয়মের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি তাদের শাস্তি কোন যুক্তি বা নীতিতে?

তাহলে বাকি যারা আইনি (valid) ভাবে চাকরি পেয়েছেন তাদের নিয়োগ বাতিল করা হলো কোন যুক্তিতে? এক্ষেত্রে যারা সবকিছুর মূলে তাদের সকলের শাস্তি দেওয়ার সাহস দেখাতে পারলে সমাজের উপকার হতো, এসএসসি-র অসহযোগিতায় কারা যোগ্য আর কারা অযোগ্য তার তালিকা তৈরি করা যায়নি। আইনি (valid) প্রার্থীদের চাকরি যাতে না যায় তার জন্য কোর্ট নিজে নিরপেক্ষ কমিশন তৈরী করে সঠিক তালিকা তৈরী করার উদ্যোগ নিলো না কেন? সমাজের দুর্বলতর মানুষকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের প্রথম শর্তই হচ্ছে অপরাধ প্রমাণ করতে না-পারলে শাস্তি দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, তা'তে যদি দু একটি অপরাধীও ছাড় পেয়ে যায় তো যাবে। এতে তো আবেদনকারীদের চাকরি ও হবে না। ওদের বঞ্চনার কোনও সুরাহা হলো না। নতুন আরো একদল যোগ্য হওয়া সত্বেও চাকরি খুইয়ে পথে বসতে চলেছে। এতদিন পর আবার নতুন করে পরীক্ষা এবং সিলেকশন হলে এদের পক্ষে চাকরি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। রায়ের এই অংশ অবশ্যই বদল হওয়া দরকার তা নাহলে এই রায় নতুন বঞ্চনার কারণ হবে। UAPA ধারায় অভিযুক্তকেই প্রমাণকরতে হয় সে নির্দোষ। ন্যায়বিচারের মূলনীতিবিরোধী এই ধারা এখন নতুন আইনে মূল আইনের মধ্যেই আনার চেষ্টা চলছে। আশঙ্কা, আগামী দিনে এই পরিবর্তনের পথে এই রায় একটা নাজির হয়ে থাকবে।

এই দুর্নীতির সাথে যারা যুক্ত তাদের দু'ভাগে ভাগ করা যায়। মন্ত্রী, সরকার, আমলা, কমিশন, শাসক দলের ছোট বড় নেতা, এজেন্ট মিলে একটা দল। এরা পরিকল্পনা করে, সরকারি প্রশাসন, সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে অসৎ উপায়ে টাকা কামানোর জন্য এই অপরাধ সংগঠিত করেছে। এরা দুর্নীতির উৎস, রূপায়ক মূল সুবিধাভোগী। এরা দুর্নীতিগ্রস্ত। দুর্নীতি উপড়ে ফেলতে হলে এদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক রায় হওয়া উচিত ছিলো। এই কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। এটাও সম্ভবত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। এই রায়দানের পর আসল অপরাধীদের চিহ্নিত করা, অপরাধ প্রমাণকরা ও শাস্তি দেওয়া থমকে যাবে। আসল অপরাধীদের হয়তো কোনোদিন ছোঁয়াও হবে না। আইন বহির্ভূত অতিরিক্ত পদ তৈরি করে বেনিয়মের নিয়োগগুলোকে বাঁচাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। হাইকোর্টের রায়ে এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনে হেফাজতে নিয়ে তদন্ত চালাতে বলা হয়েছিলো। সুপ্রিম কোর্ট এই নির্দেশের উপর stay অর্ডার দিয়েছে কিন্তু অন্যান্য নির্দেশের উপর কোনও stay অর্ডার দেয়নি। ক্ষমতার পক্ষে অদ্ভুত বৈষম্য!

উল্টোদিকে অন্য আর-এক দল হলো যারা টাকা দিয়ে অথবা রাজনৈতিক প্রভাবে অযোগ্য হওয়া সত্বেও চাকরি পেয়েছেন। এরাও অপরাধে যুক্ত। এরা এই দুর্নীতির চালক না হলেও দুর্নীতির বাহক। এরা অযোগ্য হয়ে চাকরি করছে আর যোগ্যতা থাকা সত্বেও অন্যেরা রোদে জলে অনশনে। নীতিগতভাবে নিঃসন্দেহে এদেরও শাস্তি পাওয়া উচিত। কিন্তু এদের শাস্তি কী হবে সেটা ঠিক করার সময় বাস্তবতা বিচার করার দরকার। দুর্নীতি, ঘুষ দিয়ে সুবিধা নেওয়া আজকের দিনে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সোজা পথে, আইনিভাবে চাকরি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এই রোগ দীর্ঘদিনের। তৃণমূল আমলে সেটা চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে পুলিশের শীর্ষ কর্তা সবাই শাসকের আজ্ঞাবহ। শাসকদলের হাতেই সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ এই ধারণা ক্রমশ বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। পাসপোর্ট নিতে গেলেও পুলিশকে টাকা দিতে হবে। মানুষের কাছ থেকে সৎ থাকার বিকল্প সমস্ত কিছু কেড়ে নিয়ে

অবৈধ ব্যবসার লাইনে দাঁড়ানোর বাধ্যতা তৈরি করা হয়েছে। তবু উচিত ছিলো সততার পথেই থাকা। যারা পারেনি তারা অপরাধী কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। এদের শাস্তিদানের ক্ষেত্রে এই বাস্তবতা আদালত না ভাবলে কে ভাববে এদের চাকরি বাতিল হলো, বেতন ফেরত দিতে হবে, দরকারে গ্রেপ্তার করা হবে। শাস্তির বৃত্ত পূর্ণ। Electoral Bond এর ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার রায় দিয়ে বলেছে এটা অসাংবিধানিক। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোকে এই বন্ডে পাওয়া টাকা ফেরত দিতে বলেনি। সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন, যারা মূল অপরাধী তাদের শাস্তিদানের প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ রেখে এদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক শাস্তি দেওয়াটা কতটা নৈতিক ?

অপরাধে যুক্ত শীর্ষ ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার আগেই অপেক্ষাকৃত কম দোষীদের নজরকাড়া শাস্তি দিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে ফিনিশিং টাচ দিয়ে ফেললো আদালত। বেঁচে গেলো বা বাঁচিয়ে দেওয়া হলো দুর্নীতির মূল মাথাদের। জুয়াখেলা অনৈতিক এবং অপরাধ। জুয়ার বোর্ডে হানা দিয়ে জুয়া খেলতে আসা লোকেদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ কিন্তু জুয়ার বোর্ড যারা চালায় তারা অধরা থেকে যায়। তাই জুয়াও বন্ধ হয় না। এক্ষেত্রেও একই নীতির পুনরাবৃত্তি।

এস এস সি র নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির ঘটনা সামাজিক ভাবে ব্যাপক এবং গভীর। এই ঘটনায় যুক্ত রয়েছেন বহু মানুষ। এই মামলার রায় নিয়ে সমাজে গভীর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা রয়েছে। তাই এই মামলায় আদালত সবদিক বিচার করে ন্যায়বিচার এবং সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে রায় দেবে এটাই প্রত্যাশা। কিন্তু এই রায়ের সময়কাল, ন্যায়বিচারের মূলনীতি এবং সামাজিক বাস্তবতা বিচার করে যে দাবিগুলো তোলা উচিত।

১) সামাজিক অস্থিরতা তৈরী হওয়ার আগেই অবিলম্বে এই রায়ের প্রশাসনিক রূপায়নের সিদ্ধান্ত রদ্ করার জন্য সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হবে।

২) অপরাধ প্রমাণ না করে কারও নিয়োগ বাতিল করা যাবে না। এটা অসাংবিধানিক এবং ন্যায়বিচারের পরিপন্থী।

৩) আদালতের নিয়ন্ত্রণে একটা কমিশন করে নিয়মবর্হিভূত নিয়োগ চিহ্নিত করা হোক।

৪) এই দুর্নীতির সাথে যুক্ত মূল চক্রী যারা সেই মন্ত্রী, শাসক দলের শীর্ষনেতা, শীর্ষ আমলা কিংবা গ্রামেগঞ্জে যারা এজেন্টের কাজ করেছেন সেসব ছোট বড় নেতাদের মূল অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য সময়সীমা বেঁধে তদন্তের ও বিচারের প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে।

৫) নিয়মভঙ্গ করে যাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে প্রমাণ হয়েছে তাদের শাস্তি হোক কিন্তু তাদের অপরাধের মাত্রা ও সামাজিক বাস্তবতা মাথায় রাখা হোক।

লাদাখে চলমান আন্দোলন, একটিই রেখাবৃত্ত সম্পূর্ণ করছে

অমিতাভ সেনগুপ্ত

ষষ্ঠ তফসিল-এ অন্তর্ভুক্তি, স্বশাসন ও লাদাখ তথা হিমালয়ের পরিবেশ বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করতে গত ৭ই এপ্রিল লেহ্-লাদাখের হাজার হাজার মানুষ 'পশমিনা মার্চ'-এ পথে নেমেছিলেন। এই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের গলা টিপে ধরতেও কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে জারি হয় ১৪৪ ধারা, বন্ধ করা হয় ইন্টারনেট, মিছিল রুখতে নামে সামরিক বাহিনী আর সাঁজোয়া গাড়ি। খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে শুধু লেহ নয় এই আত্মমর্যাদা আদায়ের দাবিতে পাশের জেলা কার্গিলের মানুষও জুড়ে গেছেন লাদাখবাসীর সঙ্গে। ঐ দিন নানা কর্মসূচি নিয়ে সমর্থন করেছেন দেশজুড়ে গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ আর পরিবেশ আন্দোলনকর্মীরা । লাদাখে প্রবল শৈত্য প্রবাহের মধ্যে টানা ২১ দিন অনশন অবস্থানে বসে লাদাখের মানুষের দাবিকে সারা দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন—সোনম ওয়াঙচুক। নিজেকে সত্যাগ্রহী হিসেবে পরিচয় দেওয়া মানুষটি লাদাখে জনপ্রিয় শিক্ষা সংস্কারক ও পরিবেশকর্মী হিসেবে। সোনম ওয়াঙচুক অতীতেও বারবার লাদাখ হিমালয়ে ক্রম হ্রাসমান হিমবাহের কথা, তুষারপাতের স্বল্পতা বেড়ে চলা, মেঘ ভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বান, ভূগর্ভস্থ জলস্তর শুকিয়ে আসা তথা বিপন্ন বাস্তুতন্ত্রের কথা তুলে ধরেছেন

সম্প্রতি চীন (তিব্বত) ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বেড়ে চলা সীমান্ত সংঘর্ষ নতুন সঙ্কট তৈরী করেছে। লাদাখ সীমান্তে প্রায় ২১০০মাইল বিস্তীর্ণ এলাকা ১৯৬২-র চীন ভারত যুদ্ধের (তৎকালীন Actual Line of Control বা প্রকৃত সীমান্ত রেখা চিহ্নিতকরণকে বারবার লঙ্ঘন করেই) পর থেকেই অশান্তির ক্ষেত্র হয়ে রয়ে গেছে। বিশেষত ২০২০ সালে, লাদাখ-আকসাই চীন সংঘর্ষের পর থেকে সীমান্তে ঘোষিত 'বাফার জোন'-এ চীনের আগ্রাসী ভূমিকা ক্রমেই বাড়ছে। এদিকে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে মোদী

সরকারের দ্বিচারিতা ও মিথ্যে স্তোক বাক্য লাদাখের উচ পার্বত্য অঞ্চলের বিস্তীর্ণ চারণভূমিতে যাদের বাস, সেই যাযাবর পশুপালক ধর্ম বিশ্বাসে মূলতঃ বৌদ্ধ জনজাতির মানুষের জীবনে নতুন করে বিপদ ডেকে আনছে। সোনম ওয়াঙচু'রা তাদের অনশন অবস্থান থেকে বৌদ্ধ লামা ও জনজাতির মানুষদের সঙ্গে নিয়ে বিশেষ ভাবে যে সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন তা হলো—সীমান্ত সমস্যা থেকে নজর ঘোরাতে ও কয়েকটি কর্পোরেট বেনিয়া সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দিতে ভারত সরকার 'উন্নয়ন'-এর নামে সম্প্রতি প্রায় ২০ হাজার একর জমিতে এনার্জি পার্ক বা বিকল্প সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প করার কথা ঘোষণা করেছে। এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী বিস্তীর্ণ এলাকাকে 'নো ম্যানস ল্যান্ড' ঘোষণা করে স্থানীয় মানুষের স্বাভাবিক গতিবিধিতে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে। এতে করে পার্বত্য জনজাতির মানুষের এতকালের প্রথাগত জীবন, জীবিকা-তো বিপন্ন হচ্ছেই, চরম সঙ্কটের মুখে পড়বে লাদাখের বাস্তুতন্ত্র ও জীব বৈচিত্র্য। স্বাভাবিকভাবেই তাদের বক্তব্য—হিমালয়ের সঙ্কট মানে শুধু লাদাখের সঙ্কট নয় তা' সমগ্র দেশের নদী,পরিবেশ ও কৃষির ভবিষ্যতকে সংকটাপন্ন করে তুলবে। বেশ কিছুদিন ধরেই উন্নয়নের নামে লাদাখের পরিবেশ প্রকৃতিকে কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়া ও স্থানীয় জনজাতি মানুষের মতামতকে অগ্রাহ্য করে লাদাখে কেন্দ্র শাসিত আইন চাপিয়ে দেওয়ার বিরদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হয়েছে লাদাখবাসী। এই মুহূর্তে সংসদে একজন এবং কাশ্মীর বিধানসভায় লাদাখের মাত্র দুজন প্রতিনিধি। তাদের নিজস্ব বিধানসভা নেই। নিজস্ব পাবলিক সার্ভিস কমিশন নেই। নেই লাদাখের সমস্যা তুলে ধরার মতো যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব।

গত ৭ই এপ্রিল, ২০২৪ তারা 'পশমিনা মার্চ' বা 'সীমান্তের দিকে যাত্রা'র ডাক দেন। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার মিটার উচ্চতায় বসবাসকারী যে পশুপালক জনজাতির মানুষেরা বিস্তীর্ণ চারণ ভূমিতে পশমিনা মেষ পালনের প্রাকৃতিক সুবিধায় ঐতিহ্যগত ভাবে পৃথিবী বিখ্যাত পশমিন উল তৈরী করেন; তারাই সরকারের নতুন নিয়মে—উন্নয়নের থাবায়, সেনাবাহিনীর বাধায় পৌঁছতে পারছেন না লে'র সেই উচ্চ পার্বত্য চারণ ভূমিতে। ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন তাদের ঐতিহ্যগত পেশা। তাই তাদের বিপন্ন 'পশমিনা সংস্কৃতি'কে বাঁচাতে, লাদাখের বিপন্ন সংস্কৃতির মর্যাদা ফিরিয়ে দিতেই ওই 'পশমিনা যাত্রা'র ডাক দেন আন্দোলনকারীরা। তারপরেই সমস্ত গণতান্ত্রিক কণ্ঠস্বরকে দমন করে বিজেপি সরকার ঐ দিনের যাত্রায় নিষেধ আরোপ করে, সামরিক বাহিনী নামায়, ১৪৪ধারা জারি করে, লাদাখে ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ন্ত্রণ করে ও সোনম ওয়াংচুকের কয়েকজন সাথীকে আটক করে। ২১দিনের শেষে সোনম ওয়াঙচুক অনশন ভাঙলেও তারপর থেকে ধারাবাহিকভাবে লাদাখে মহিলারা,ছাত্র যুবকেরা ও প্রায় ১৬টি গুম্ফা বা বৌদ্ধ মঠের ভিক্ষুরা ৪৫ দিন পার করে 'রিলে অনশন' অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন।

আজ, ২০২৪ সালে দাঁড়িয়ে পাঁচ বছর আগের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ষষ্ঠ তফসিলকে ঘিরে গড়ে ওঠা গণদাবি ভুলে গেলে চলবে না। কারণ, তারই ধারাবাহিকতায় আজ লাদাখের জনজীবন প্রতিবাদে উত্তাল হয়েছে।

লাদাখের মানুষের এই ষষ্ঠ তফসিলে অন্তর্ভুক্তির দাবি কেন ?

সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিল অনুসারে জনজাতি এলাকায় বহু অধিকার সংরক্ষিত হয় সেখানকার আদিবাসী মূলবাসী মানুষের জন্য। লাদাখ এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হলে এলাকাবাসীরা প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার উপভোগ করতে পারতেন। জঙ্গলের ব্যবহার, কৃষিকাজ, গ্রাম-শহরের পরিষেবা পরিকাঠামো, সম্পত্তির উত্তরাধিকার সহ একাধিক বিষয়ে তাদের অধিকার সুনিশ্চিত হত। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের আগে বিজেপির নির্বাচনী ইশতেহারেও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে লাদাখবাসীর ষষ্ঠ তফসিলে অন্তর্ভুক্তির দাবি মেনে নেওয়া হবে। কিন্তু দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পরেই এ-বিষয়ে বিজেপি 'নীরব' হয়ে যায়।

বাস্তবে যা ঘটে তা হলো ২০১৯ সালে ক্ষমতায় এসে বিজেপি সরকার কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বাতিল করে এবং লাদাখকে জম্মু-কাশ্মীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের তকমা দেয়। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হওয়ায় লাদাখের প্রশাসন, আমলাতন্ত্র থেকে সরকারি ব্যবস্থা গোটাটাই দিল্লী থেকে নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। হিল কাউন্সিল বা পার্বত্য পরিষদগুলির ক্ষমতা খর্ব করা হয়। কেন্দ্রের নির্দেশে চলা আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বাড়তে থাকে। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতেও ঐ এলাকার মানুষের অংশগ্রহণ বা প্রতিনিধিত্ব হ্রাস করা হতে থাকে। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই লাদাখের সাধারণ মানুষের মধ্যে 'নিজভূমে পরবাসী' হয়ে পড়ার ক্ষোভ জন্মাতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই জনতার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে লাদাখে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে থাকে। সংবিধানে লাদাখের ষষ্ঠ তফশিলে অন্তর্ভূক্তিকরণের আওয়াজ জোরালো হয়। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন লাদাখের স্বতন্ত্রতার

পক্ষে আওয়াজ তুলতে থাকে। লাদাখের দুই জেলা লে এবং কার্গিলে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় সংগঠন, রাজনৈতিক দল, ছাত্রছাত্রীদের সংগঠন গড়ে ওঠে।

দু'টি মঞ্চ Leh Apex Body এবং Democratic Alliance Kargil প্রতিবাদে নামে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা তুলে নেওয়ার পর লাদাখের বিজেপি প্রভাবিত এলাকায় সমর্থকেরা উগ্র জাতীয়তাবাদী উল্লাস দেখিয়েছিলো। তাদের অনেকেই আজ লাদাখ বাসীর বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হচ্ছে।

ইতিহাস সাক্ষী থাকছে, রাষ্ট্র যখন পুঁজির স্বার্থে জনগণের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে; তখন শুধু লাদাখ নয়, মণিপুরের পাহাড়ে আদানিকে প্ল্যাটিনাম খনি পাইয়ে দিতে NRC দিয়ে সংখ্যালঘু কুকি জনজাতির মানুষদের বহিরাগত বলে উৎখাত করা, বা ছত্রিশগড়ে বক্সাইট খুঁড়ে বেচা জিন্দাল আদানিদের পাহারাদারদের হাতে 'অপারেশন গ্রীন হান্ট'-এ উদ্বাস্তু হওয়া সাঁওতাল বা গোন্ড আদিবাসী মানুষ; সবাই মিলে যাচ্ছে সম্পূর্ণ হতে চলা এক বৃত্তে।

আমার ভারত ওদের ভাষ্য

সোমনাথ বসু

[যোজনা কমিশনের উদ্যোগে ২০০৬ সালে, উন্নয়নের পথে (মাথা চাড়া দেওয়া) অসন্তোষ, আশান্তি এবং চরমপন্থার কারণ অনুসন্ধানে ১৬ জন বিশিষ্ট সদস্য নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞমন্ডলী তৈরী হয়। ২০০৮ সালে এই কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। যদিও এই রিপোর্ট জন-সমক্ষে আসেনি।]

(ষষ্ঠ কিস্তি)

১৯৯৭ সালের ২৪শে মে, মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে এবং সেখানকার আলোচনার ভিত্তিতে উঠে আসা গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে উপযুক্ত করণীয় নানা পদক্ষেপ ও কার্য্যসূচি গ্রহণ action plan প্রযুক্ত হবে— এই ঘোষণার মধ্যে দিয়েই উত্তম শাসন প্রণালী (Good Governance) স্পষ্ট হয়। উল্লিখিত আলোচনা আর সমস্ত আলোচ্য সূচী অনুযায়ী যাবতীয় পদক্ষেপ-ই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরই ফলস্বরূপ এই কার্যক্রমের follow up action ২০০৫-এর ২৮ শে জুন, জ্জ— ষ্ঠত্রন্স্ঠথষ্ঠত্র ঙ্খদ্রন্ড— ত্থুত্তএর নবম বৈঠকে গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়।

উন্নত শাসনতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত কার্য্যসূচী বা পদক্ষেপগুলি নাগরিকরা সাধারণভাবে যে সমস্ত রাষ্ট্রীয় সমস্যার সন্মুখে পড়েন সে-সব নিয়েই। কিন্তু সামাজিকভাবে ব্রাত্য করে দেওয়া SC/ST/OBC মানুষদের রাষ্ট্র ও বৃহত্তর সমাজ কর্তৃক প্রতিমুহূর্তে যে সমস্যায় ভুগতে হয় তা' নিয়ে এখানে তেমন কোনও মাথাব্যথা দেখানো হয়নি। সাধারণ নাগরিকরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর সামনে যে-যে সমস্যায় পড়েন ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর সমস্যা ওই তালিকার চেয়ে অনেক গুণ দীর্ঘ্যতর। এবং এই সমস্ত সূচক দেখিয়ে "উত্তম শাসন ব্যবস্থা" (good governance) অনায়াসেই ব্রাত্যজনের সমস্যা গুলিকে একপাশে ঠেলে রাখতে পারে বা এড়িয়ে চলতে পারে। এই কথাগুলো বলবার সময় যদিও আমরা, কেন্দ্রীয়ভাবে যে সমস্ত পদক্ষেপগুলি নেওয়া হচ্ছে, সেগুলি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছি না। কারণ, সেগুলি কিছুটা পরিমাণে হলেও তথাকথিত ব্রাত্য জনের কিছু সুরাহা তো দিচ্ছে। কিন্তু অহরহ তাদের যে বাধার সম্মুখীন হতে হয় তার মূল রয়েছে সরকারের সমস্ত বিভাগে (আইন সভা, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা) তাদের প্রতি সংবেদনহীন নিষ্করুণ মনোভাবের মধ্যে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুগ-যুগান্তর ধরে সামাজিক ভাবে গেড়ে বসে থাকা পক্ষপাত দুষ্ট ধারণার মধ্যে। এই পক্ষপাত সুদীর্ঘকালের প্রভুত্বকারী সমাজ ব্যবস্থার গর্ভজাত এক (দুর্গত অবস্থা) খোয়ারি (Hangover)। এমনকি ধর্মীয় সংখ্যালঘুরাও তাদের সামাজিক ব্যবহারে তা আত্মস্থ করে নিয়েছে। এই মনোভাবের প্রতিফলন ঘটে লোক-বুঝে ব্যবহারে এবং সহজে সিদ্ধান্ত নেওয়ায়- যার ফলে, এই সমস্ত মানুষকে কত সহজে এরা আইন বলি,সরকারি নীতি বলি, সরকারি সুবিধা বলি, কর্মসূচী বলি সবকিছু থেকে বঞ্চিত করে রাখে। শাসন ব্যবস্থা কে যদি 'উত্তম' হতে হয়, তাহলে এই বিষয় সব-সময়ের জন্য মাথায় রাখা অত্যাবশ্যক।

উপরোক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী উত্তম শাসন বা ভালো শাসনব্যবস্থা হতে হবে বহুমাত্রিক। এর অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলি হবে---সুরক্ষা, বিকাশ, অংশগ্রহণ, কার্যকরী প্রশাসন, দায়বদ্ধতা, Inclusive Politics, এবং হিংসাকে দেখার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন(Paradigm shift)।

SC/ST দের উপর নিপীড়নের ঘটনা বেড়েই চলেছে। তাদের ওপর আক্রমণ ঠেকাতে আইনসম্মত যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে সেগুলি পুরোপুরি অকেজো। তার কারণ হিসেবে বলা যায়, গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারী আইনগুলি (যেমন, PCR act–~î, SCand STSPrevention of atrocitiesVActV হতাশাজনক ভাবে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে পড়ে থাকে। এই

Atrocities Act আর পাঁচটা আইনের মত কোনও সাধারণ শাস্তিযোগ্য আইন না। এই আইন এবং তার রুলে SC/ST- দের ওপর নিপীড়ন বন্ধ এবং তাদের সুরক্ষার বিধি নিয়মের বিস্তৃত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া আছে। কিন্তু ওরা সামাজিকভাবে চরম পক্ষপাতিত্ব দায়সারা নিয়ম রক্ষার মনোভাব এমন-কী কপালের ফেরে বন্ধ মামলার প্রত্যাহার—এরকম একটার পর একটা ঘটনা তাদের সুরক্ষা আইন কে কাঁচকলা দেখিয়ে চলে। SC/ST দের ওপর নিপীড়নের সাজা ? এক শতাংশেরও নীচে। সরকারি পরিসংখ্যানই বলছে—

SC/ST নিপীড়ন

১) ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, অন্ধ্রপ্রদেশের পেদাকালিক্রি গ্রামে এক দলিত শোভাযাত্রা'র জন্য যানবাহন চলাচলে কিছুক্ষণ বিলম্ব হয়।

একজন উচ্চবর্ণের যুবক, বেনু নাইডু বাস থেকে নামে, দলিতদের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করে, তারপর দলিতদের ওপর আক্রমণ চালায় এবং মোগলি এসোয়ার(Mogili Eswar)নামে একজনের দুটি হাতই কেটে ফেলে

২) বিহারের এক পানের দোকানি জনৈক পাসওয়ান উচ্চবর্ণের রাজিন্দর সিং কে বিনীতভাবে অনুরোধ করেছিল তার পাতলা পাটাতনটিতে না বসতে নইলে পাটাতনটা তাঁর ভারে ভেঙে যেতে পারে।

উত্তরে রজিন্দর সিং তার ওপর তেড়ে ওঠে, গালিগালাজ করে, গায়ে হাত তোলে এবং কোনও পয়সা না দিয়ে দোকান থেকে মালপত্র উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়।

৩) বিহারের হারিওবাড়া গ্রামে বসবাসকারী ভুঁইয়া দলিতরা জমির মালিকের দেওয়া জমিতে একটু পোল্ট্রি করবার চেষ্টা করেছিল যাতে দিন চালানোর একটু সুবিধা হয়। জমির মালিকের স্থানীয় ম্যানেজার তাদের গালিগালাজ ও মারধোর করার পর তাদের পোষ্য গুলিকে কেটে টুকরো টুকরো করে দেয়।

৪) মহারাষ্ট্রের সোলাপুর জেলার উপেল দুমালা গ্রামে, হিন্দু সাবর্ণ সম্প্রদায়ের লোকেরা দলিতদের সাংস্কৃতিক যাত্রা মিছিল আটকায়। সাবর্ণরা দলিতদের আক্রমণ করে এবং সর্বসাধারণের যাতায়াতের রাস্তাতেও তাদের উঠতে দেয় না। পরিষ্কার বোঝা যায়, উচ্চ বর্ণের অসহযোগিতা এবং মারকুটে মনোভাবের সামনে দলিতদের সংস্কৃতি মরতে বসেছে।

৫) ৯ই অক্টোবর, ২০১১, উড়িষ্যার জয়াপাটনার কাছে করলাকোট বাজারের ঘটনা। জনৈক দলিত মানুষ রান্না করে খাবে বলে মাছ কিনতে এসেছে । উচ্চবর্ণের একজনের কাছে শুনতে হয়, ‘‘এই ডোমেরা, তোরা জন্মে কোনওদিন মাছ খেয়েছিস ?’’ উচ্চবর্ণের বিদ্রূপ, অপমান ,তাচ্ছিল্যে দলিতরা কী-কী খাবে তাও সীমিত হয়ে আসছে। যেন, সবাই যা'-খায় তাদের সেসব খাবার অধিকার নেই।

৬) রাজস্থানের কারাউলি জেলার সুরাথ গ্রামে দয়াল নামের এক দলিত উচ্চবর্ণের এক চা-দোকানির কাছে এক কাপ চা চেয়েছিল। ফলস্বরূপ দয়ালকে গালিগালাজ মারধরের পর মিথ্যে মামলায় জেলে ভরে দেওয়া হয় এবং সেখানেও পুলিশের হাতে হেনস্থা হতে হয়।

৭) ২০০৭- এর ৬ই মার্চ, মহারাষ্ট্রের শিন্দেতে দলিতরা তাদের অধিকার আদায়ে সংঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করেছিল। উচ্চবর্ণের দলবদ্ধ হামলায় কুড়িজন দলিত গুরুতর রূপে আহত হয় এমন-কী শিশু এবং মহিলারাও নৃশংসতার হাত থেকে রেহাই পায়নি। দলিতদের বস্তি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। দলিতরা এখন নিরাপত্তাহীনতা এবং Fear Psychosis-এ ভুগছে।

৮) ১৮ই আগষ্ট, ২০০৪-এর, বিহারের সমস্তিপুরের হংস গ্রামের ঘটনা—যেখানে নিজের সন্তান অমরনাথের অপহরণ ও হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদরত দলিত পিতা সাবাই মাহাতোকে জনৈক পুলিশ অফিসার রাজেশ কুমার রায় গুলি করে হত্যা করে। ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্তৃপক্ষ এবং জেলা প্রশাসনের অভয় পরশে বলীয়ান রাজেশ কুমার রায় সাবাই মাহাতোকে গ্রেফতার করে, জেলে পাঠায়, সেখানে অত্যাচার করে এমন-কী জেলের ভেতরে হত্যা করে।

৯) অনাবাদী জমিতে দলিত সম্প্রদায়ের জনৈক জয়ন্তী লালের অনেকগুলি আম গাছ ছিল উত্তরপ্রদেশের সুরাইয়া মাজরার ফতেপুরের মাজগাও শরীফে। ওই গ্রামেরই রাজেন্দ্র প্রসাদ জোর করে গাছগুলি কেটে নেয়। All India Pasi Samaj এর ব্যানারে দলিত মানুষরা ২৪শে জুলাই,২০০৪ সালে বিধানসভার সামনে এর প্রতিবাদে ধরণা শুরু করে। উচ্চ জাতের অহংকারে মত্ত পুলিশ বাহিনীর নির্বিচার লাঠি চালনায় জয়ন্তী দৃষ্টি শক্তি হারায়।

১০) ২০০৪ সালের ৩রা আগষ্ট, মোহন তার সারাদিনের জন্য তৈরী ‘ডাল পাখোয়ান’ বিক্রি করে দেওয়ার পর জনৈক সোনু তা কেনার দাবি করে। ঘটনাটি রাজস্থানের আজমিরের গুজর ধরতির কথা।সারাদিনের মতো ডাল পাখোয়ান বিক্রি শেষ

হয়ে গেছে , সে আর পাবে না শুনেই সোনু তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। সে ধারালো অস্ত্র মোহনের পেটে ঢুকিয়ে দেয়। আজও পর্যন্ত গ্রেপ্তার তো দূরের কথা পুলিশ সোনুর হদিসই পায়নি।

১১) ১৪ই ডিসেম্বর, ২০০৩, একজন দলিত আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী উচ্চ বর্ণের মানুষের হেনস্থার হাত থেকে জনৈক দলিত রমণীকে বাঁচিয়ে ছিলেন পুলিশের যোগ সাজসে সেই উদ্ধার কর্তাকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

১২) জাতি ঘৃণার কারণে ২০০৪ সালের ২৯শে জানুয়ারী, জনৈক দলিত যুবককে থানায় আটকে রাখা হয়। তার উপর চূড়ান্ত ও নির্মম শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন চালানো হয়। আতঙ্ক ও অত্যাচার সইতে না-পেরে সে সেখানেই আত্মহত্যা করে।

—শেষ অংশ ৩২ পাতায়

চিঠি

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এ পি ডি আর-এর কার্য্যকরী ভূমিকা কী?

হামিদ সরকার

কেন্দ্রের বিজেপি আর-আর এস এস পরিচালিত সরকার ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা পাকা পোক্ত করে রাষ্ট্রের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করেছে। বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন সহ প্রশাসনের সর্বত্র নিজেদের প্রভাব সংগঠিত চেহারা দিতে সক্ষম হয়েছে। সংবিধানে ফৌজদারী আইন পাল্টে দিয়েছে। একটি সম্প্রদায়কে সরাসরি টার্গেট করে আক্রমণ সংগঠিত করেছে। হিটলারকে আইডিয়াল ঘোষণা দিয়ে ‘অগ্নীবীর’ সেনা গঠন করেছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ঢাকতে জাতি বিদ্বেষকে উসকে দিয়ে একটি সম্প্রদায়কে দেশের মূলস্রোত সরিয়ে দিতে হীনমনা করে, হতাশার দিকে ঠেলে প্রতিক্রিয়ার ফাঁদ পেতে প্ররোচনা মূলক ধারাবাহিকি কর্ম্মসূচী পালন করে চেলেছে। এবার নির্বাচনে ফ্যাসিবাদী শক্তি জয়লাভ করলে দেশের গণতন্ত্র ধ্বংস হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে পরাভূত করতে এ পি ডি আর-এর ইতিবাচক ভূমিকা কী! এ-কথাও ঠিক, সব শাসকের মধ্যে কিছুটা তারতম্য থাকলেও ‘সব শিয়ালের এক রা’, এ-কথা মনে রেখেই বলতে হচ্ছে, এখন পার্শ্বের শত্রু বাড়ীতে আগুন লেগেছে’ আগুন না-নেভানোর ব্যবস্থা করলে নিজের ঘরটাও পুড়বে। বর্তমান উদ্ভুত পরিস্থিতি গণতন্ত্রের যে-টুকু সুযোগ আছে তার সৎ ব্যবহার করা যায় কী-না ভাববার সময় এসেছে। ধরে ধরে উদারণ দেওয়া যেতে পারে তা সবই সকলের জানা। সুতরাং সে সব আলোচনা দরকার আছে বলে মনে হয় না।

রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির দাবি

প্রথমতঃ রাজনৈতিক বন্দির সংজ্ঞা ঠিক করা দরকার। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির দাবি করলে পক্ষপাত দুষ্ট হওয়ায় বোঝানো হয়। রাজনৈতিক দলের নেতার পক্ষেই ওকালতি করা হয়। প্রতিনিয়ত দেশের নানা প্রান্তে রাষ্ট্রীয় সংস্থা কর্তৃক বিশাল সংখ্যক মানুষকে আটক করছে।রাজনৈতিক নেতা-কর্ম্মী-তো বটেই সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক ছাত্র শ্রমিক , কৃষক যে কাউকে যে কোনও সময় আটক করছে। সবাইকে চরম আতঙ্কের পরিবেশের মধ্যে চলতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় শুধুমাত্র একপেশেভাবে রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির দাবি সম্পূর্ণ দৃষ্টভঙ্গীর পরিচায়ক নয় কি? রাষ্ট্র কর্তৃক নির্যাতিত কালা কানুনে আটক বিনা বিচারে সমস্ত বন্দিদের মুক্তির দাবি স্বচ্ছতার সাথে বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারিত হওয়ার দাবি রাখে না?

সামাজিক সম মর্যাদার অধিকার

জাত-পাত ধর্মীয় বিদ্বেষ সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে- মনুষ্য প্রজাতি হিসাবে স্বীকৃত অধিকার- মানুষের মর্যাদার প্রশ্নে বিজেপি-আর এস এস আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করে চলেছে। উদাহরণ নিঃস্প্রোয়জন। শূদ্রদের জন্ম হয়েছে অন্যদের সেবা করার জন্য, বিজেপি নেতারা প্রকাশে ঘোষণা দিয়েছে। তপশীলী জাতি উপজাতি, নমশূদ্র, ইত্যাদি জাতিভুক্ত মানবরা অচ্ছুত; মন্দির উদ্বোধনে-তো দূর কথা, নব নির্মিত পার্লামেন্ট ভবন উদ্বোধনে দেশের সর্বোচ্চ পদাধিকারী রাষ্ট্রপতিকে পর্যন্ত আমন্ত্রণ পাঠায়নি। এ-যে দেশের মানুষের কাছে কত বড় লজ্জার বিষয়, তা এ-দেশেই সম্ভব। আথচ প্রায় ৮৭ শতাংশ মানুষই তথাকথিত নীচু সম্প্রদায় (মুসলমান সহ) ভুক্ত। তবুও তারা অচ্ছুত । সি এ এ, এন আর সি উদ্দেশ্য শূদ্র, দলিত আদিবাসী --- মানুষদের ব-কলমে সেবা দাস বানানোর ছক কষেছে। দেশে মুসলমানরা-তো জন্মসূত্রে নাগরিক; অন্যদিকে বেশীর ভাগ মানুষ দলিত, আদিবাসী শূদ্র সমাজভুক্ত মানুষদের এন আর সি'র শর্ত পূরণে ব্যর্থতা বিপদগ্রস্ত করে তুলবে। এবং তাদের মনুবাদ প্রয়োগের ভয়ঙ্কর বলু-প্রিন্ট রচনা করেছে। তাই সম মর্যাদার প্রশ্নে এ পি ডি আর কার্যকরী কর্মসূচী নিয়ে চর্চা হওয়ার দরকার।

প্রতিবেদন

আকাশ পথে বোমাবর্ষণের পর ছত্রিশগড়ের প্রতিবাদী জনসাধারণের ওপর আবারও ভয়ংকর রাষ্ট্রীয় হামলা

২০২৪ সালের জানুয়ারী থেকে এপ্রিল এই সাড়ে তিন মাসের মধ্যে ৭৮ জনকে ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা

ভারত রাষ্ট্রের ছত্তিশগড় রাজ্যটি জঙ্গল পাহাড় দিয়ে ঘেরা। গোটা এলাকা বিভিন্ন মূল্যবান ধাতু ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। গ্রাফাইট, বক্সাইট, লৌহ আকরিক, চুনাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ, সোনা ইত্যাদিতে সারা ছত্রিশগড় ভরপুর। বড় বড় কর্পোরেট হাঙর একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করে এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করছে; জনগণের ব্যাপক প্রতিবাদের মধ্যেই। জল জঙ্গল জমির অধিকার নিয়ে এখানকার মানুষের মরণপণ সংগ্রাম অনেকদিনের। গত দু'বছর থেকে জনগণের এই প্রতিরোধ ভাঙার জন্য মাঝেমাঝে আকাশপথে ড্রোন থেকে বোমা বর্ষণ করা হয়। ভারত রাষ্ট্রের সিআরপিএফ, কোবরা, সহ নানা বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ এই আক্রমণ চালায়। রাজ্যের বিগত কংগ্রেস সরকার, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সাথে হাত মিলিয়েই এই আগ্রাসন চালায়। কার্যত, নাগরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে আমাদের ভারত রাষ্ট্র।

বোমাবর্ষণ করেও এলাকার জনসাধারণের প্রতিবাদ থামাতে না পেরে এই বছর থেকে ফের শুরু করেছে ভুয়ো সংঘর্ষে গণহত্যা। ইতিমধ্যে ছত্রিশগড়ে কংগ্রেস সরকার পরিবর্তিত হয়ে এসেছে বিজেপি সরকার। আসন্ন সংসদীয় নির্বাচনের ঠিক আগেই এই আক্রমণ আরও ভয়ংকর ও তীব্র হয়েছে। দ্য হিন্দু, টাইমস অব ইন্ডিয়া সহ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় মহিলা ও নাবালিকা সহ ৪৯ জনকে হত্যা করেছে ছত্তিশগড়ের বিজেপি সরকার পরিচালিত যৌথ বাহিনী। মহিলাদের ধর্ষণ ও নৃশংস অত্যাচার চালানোর পর গুলি করে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। বোবা, প্রতিবন্ধী নাবালিকা মেয়েকেও রেয়াত করেনি ভারত রাষ্ট্রের সিআরপিএফ, কোবরা, তেলেঙ্গানার গ্রেহাউন্ড ও রাজ্য পুলিশ বাহিনী। নিহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সেনা পোশাক পরা মাওবাদী রাজনৈতিক কর্মীও আছে বলে সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে।

এলাকার বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের কর্মী ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অভিযোগ বৃহৎ কর্পোরেটের প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ ও গ্রামের মধ্যে সিআরপিএফ ক্যাম্প গড়ার প্রতিবাদে সামিল সাধারণ গ্রামবাসীদের ভুয়ো সংঘর্ষের নামে হত্যা করা হচ্ছে। খবরের কাগজ ও এলাকার মানবাধিকার কর্মীদের বক্তব্য অনুযায়ী বিজাপুরের করচলি ও লেন্দ্রা গ্রামে সবচেয়ে বড় ভুয়ো সংঘর্ষে নৃশংসভাবে ১৩ জন জল জঙ্গল জমির অধিকার রক্ষা আন্দোলনে যুক্ত প্রতিবাদী জনগণকে হত্যা করে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ মিলে। এদের মধ্যে দু'জন মহিলা ও একজন প্রতিবন্ধী বোবা মহিলা ছিলেন। এরা প্রত্যেকেই আদিবাসী। সমাজকর্মী বেলা ভাটিয়ার কথা অনুযায়ী, তিনজন ছাড়া বাকি ১০ জনকে হাত বেধে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হেফাজতে থাকা অবস্থায় নৃশংস ভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। প্রতিবন্ধী বোবা নাবালিকাকে ধর্ষণ ও নৃশংসভাবে অত্যাচার করে খুন করা হয়। তাকে এমন ভাবেই অত্যাচার করা হয় যে মেয়েটির মৃতদেহ দেখে তার মা চিনতে পর্যন্ত পারেনি। করচলি গ্রামে তার ঘর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে এই নৃশংস হত্যা গ্রামের লোক ও অধিকার আন্দোলনের সংগঠনগুলি কোনোমতেই মেনে নিতে পারেনি। তারা এই ঘটনা প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। সব থেকে মারাত্মক, একসাথে ১৩ জনকে এনকাউন্টারের নামে গণহত্যা করা হলেও বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো মুখে কুলুপ এঁটে আছে।

গত ১৬ এপ্রিল ২০২৪, ছত্তিশগড়ের কাঙ্কের জেলার ছোটাবেথিয়া থানা এলাকায় সিপিআই মাওবাদী পার্টির ২৯ জন সদস্যকে এনকাউন্টারে খুন করা হয়েছে বলে হিন্দুস্থান টাইমস সহ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা যাচ্ছে। একদিকে ছত্তিশগড় বিজেপি সরকার মাওবাদীদের সাথে শান্তি চুক্তি করার কথা সমস্ত মিডিয়ার সামনে বিরাট করে ঘোষণা করছে, আর অপরদিকে বিএসএফ, সিআরপিএফ, কোবরা, ডিআরজি সহ সমস্ত আধাসামরিক বাহিনীকে মাওবাদীদের খতম করার জন্য লেলিয়ে দিচ্ছে। আর এই সব কিছুই করা হচ্ছে আসন্ন পার্লামেন্টারী সাধারণ নির্বাচনের নামে। গত সাড়ে তিন মাস ধরে ছত্তিশগড়ে সব মিলিয়ে ৭৮ জন জল জঙ্গল জমির অধিকার রক্ষাকারী লড়াকু জনগণকে ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যার বিনিময়ে, বন্দুকের নলের ডগায় হতে চলেছে ভারত রাষ্ট্রের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সর্ববৃহৎ উৎসব পার্লামেন্টারী সাধারণ নির্বাচন! আসলে সমস্ত খুনে অভিযানটাই চালানো হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ ছত্তিশগড়ের ওপর কর্পোরেট দখলদারির স্বার্থে।

ভারত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী প্রত্যেকটি সরকার মানবাধিকার সনদসহ আন্তর্জাতিক সমস্ত আইনকে বুড়ো

আঙ্গুল দেখিয়ে এনকাউন্টারের নামে হত্যা, গণহত্যা, হেফাজতে হত্যা, ধর্ষণ, বেআইনি গ্রেফতার সহ সমস্ত ধরণের বর্বরতা অবলম্বন করে চলেছে। ভারতীয় সংবিধানের রাজনৈতিক মত প্রকাশের অধিকার, সংগঠন করার অধিকারকে কোনও তোয়াক্কা না করে কর্পোরেটের স্বার্থে দেশের জল জঙ্গল জমির অধিকার ও লুঠের বিরোধিতা যারা করছে তাদের হয় ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা করছে, নয়তো বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থাকে পেছনে লাগিয়ে বছরের পর বছর ধরে গারদের অন্তরালে পচিয়ে মারছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বিরোধী প্রধান-প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো একদিকে লোক চক্ষুর সামনে জনবিরোধী কালাকানুন ইউএপিএ আইনের বিরোধিতা করছে, অপরদিকে নিজ-নিজ রাজ্যে রাজনৈতিক বন্দিদের ইউএপিএ দিয়ে জেলে পচিয়ে মারছে। একদিকে তারা ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বলছে অপরদিকে নিজের নিজের রাজ্যের জেল গুলিতে ইউএপিএ দেওয়া মুসলিম বন্দির সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

এই মুহূর্তে সকলে মিলে ছত্রিশগড়ের জল জঙ্গল জমির অধিকার লুঠের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী জনসাধারণের পাশে দাঁড়ানো খুব দরকার। ওই এলাকার মানুষের ওপর নামিয়ে আনা ভয়ংকর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরোধিতায় ও ইউএপিএ বাতিলের দাবিতে সম্মিলিতভাবে পথে নামা বর্তমান সময়ের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দাবি।

তথ্যানুসন্ধান

হুগলী জেলার তারকেশ্বরে আলু চাষে বিপর্যয়

হুগলী জেলার তারকেশ্বরে আলুচাষীরা অদ্ভূতদর্শন ও অখাদ্য আলুর ফলন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন জানতে পেরে এপিডিআর হুগলী জেলা কমিটির একটি তথ্যানুসন্ধানী দল গত ১৮-০৩-২০২৪ তারিখে হুগলী জেলা কৃষি আধিকারিক ও ২১-০৩-২০২৪ তারিখে তারকেশ্বরের আস্তারা গ্রামে ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের সাথে সাক্ষাৎ করে।

জেলা কৃষি আধিকারিক জানিয়েছেন—

১) যে আলুবীজের কারণে সমস্যা হয়েছে তা প্রত্যয়িত নয়।

২) কী কারণে এরকম হয়েছে এখনও জানা যায়নি।

৩) আলুবীজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের বকেয়া টাকা দিতে বারণ করা হয়েছে।

৪) আলুবীজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের চেষ্টা করা হচ্ছে।

৫) আলুব্যবসায়ীরা খারাপ আলু কিনে নেবেন।

৬) কেন বা কী-ভাবে আলু খারাপ হয়েছে তা এখনও জানা নেই।

তথ্যানুসন্ধানী দল আস্তারা গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের সাথে কথা বলে জানতে পারে, তাঁরা আস্তারার প্রভাস (টিঙ্কু) দোলুই ও তারকেশ্বরের দীপঙ্কর বেরার থেকে আলুবীজ কিনেছিলেন। প্রভাস দোলুইকে বাড়ীতে পাওয়া যায়নি। দীপঙ্কর বেরার সাথে যোগাযোগ করা যায়নি। প্রভাস দোলুই-এর জ্যাঠতুতো দাদা উত্তম দোলুই, যিনি নিজেও আলুবীজের ব্যবসা করেন, তাঁর সাথে কথা হয়েছে। পরে প্রভাস দোলুই-এর সাথে ফোনে কথা বলা হয়েছে।

যে বীজের থেকে এই খারাপ আলু হয়েছে তা আনা হয়েছে পাঞ্জাবের জলন্ধরের সুরিন্দর ফার্ম থেকে।

আগাম টাকা দিয়ে বীজ আনা হয়েছে। ক্ষতিপূরণ আদায় করা সম্ভব নয়। আলু ব্যবসায়ীরা খারাপ আলু কিনবেন, এমন কোনও কথা চাষীরা জানেন না। কোনও সরকারী আধিকারিক এলাকায় গিয়ে চাষীদের সাথে কথা বলেননি।

আলুবীজ ব্যবসায়ীরা খাতায় কলমে আলু ব্যবসায়ী। প্রকৃতপক্ষে চাষীরা আলু কেনেন, বীজ নয়। সুতরাং, প্রত্যয়িত বা ট্রুথফুল বীজের কথা বাহুল্য মাত্র।

আলুবীজ (?) ব্যবসায়ীরা আগামী রবিবার (২৪-০৩-২০২৪) মিটিং করে তাঁদের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবেন।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে বৃহৎ আলুবীজ (?) ব্যবসায়ীরা তাঁদের থেকে বীজ নেওয়া ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের সাথে এক ধরণের সমঝোতা করে নিয়েছেন। তালপুর, কেটারাতে এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে গড়বেতার ধাধিকায় এই একই ধরণের বিপর্যয় ঘটেছে।

আমাদের দাবি: সরকারকে—

১) ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২) আলু ব্যবসার বকলমে আলুবীজের ব্যবসা বন্ধ করতে হবে।

৩) প্রত্যয়িত বীজ যোগানের ব্যবস্থা করতে হবে।

তথ্যানুসন্ধানী দল: অমল রায়, কমল দত্ত, কল্যাণ আদক (তারকেশ্বর গ্রীনমেটস), জয়দেব দাস, চৈতালি দাস, বাপী দাশগুপ্ত।

তথ্যানুসন্ধান: শামসেরগঞ্জ শাখা

২৭ বছরের জীবন্ত তরুণকে রাস্তা থেকে মুর্শিদাবাদের শামসেরগঞ্জ থানা তুলে নিয়ে গেল। ৭ দিন পরে জঙ্গীপুর সাব জেল থেকে মৃতদেহ এলো।

দাউদ শেখের হেফাজতে অস্বাভাবিক মৃত্যু আসলে মৃত্যু, না হত্যা?

হায়দার আলী

১৭ ই এপ্রিল ২০২৪, এপিডিআর সামশেরগঞ্জ শাখার সভাপতি, সম্পাদক, সদস্যসহ একটি দল তথ্যানুসন্ধানে গিয়েছিল। মৃত দাউদ শেখের বাড়ি, গ্রাম হাউসনগর, পোস্ট তিনপাকুরিয়া, থানা শামসেরগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ। দাউদের বাবা-মা, স্ত্রী এবং গ্রামের কিছু লোকজনের সাথে কথা বলে সামশেরগঞ্জ শাখার সদস্যরা।

দাউদ শেখ গাড়ির খালাসি হিসাবে কর্মরত ছিলেন। বয়স ২৭ বছর। দাউদের পিতা মইনুল শেখ জানান, ৭ই এপ্রিল ২০২৪ সকালে বাড়ি থেকে কাজে রওনা দেয় দাউদ। সেই ৭ই এপ্রিল থেকে ১৩ই এপ্রিল অর্থাৎ ৬ দিন দাউদের কোন খোঁজ ছিলনা। ঈদের পরেরদিন ১৩ ই এপ্রিল, ২০২৪ সামমশেরগঞ্জ থানা দাউদের মৃত্যু সংবাদ ঘরে পাঠায়। থানা থেকে জানায়, মৃত দাউদ আছে জঙ্গিপুর হাসপাতালে। থানার কথা অনুযায়ী জঙ্গিপুর হাসপাতাল লাগোয়া মর্গে গিয়ে মৃত দাউদকে দেখতে পায় তাঁর পরিবার। হাসপাতালের ডাক্তার দাউদের পরিবারকে জানান, মৃত অবস্থায় হাসপাতলে নিয়ে আসা হয়েছিল দাউদকে। জেল কর্তৃপক্ষ জানান, জেল হেফাজতেই দাউদ গলায় গামছার ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। দাউদের আব্বা লাশের গলায় একটা সরু দাগ দেখতে পান। তিনি বিশ্বাস করেন, গামছা লাগিয়ে আত্মহত্যা করলে দাউদের গলায় এরকম সরু দাগ থাকত না। তাঁর অভিযোগ, "আমার ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে। এর তদন্ত চাই। এর বিচার চাই।" দাউদের স্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনেরও একই বক্তব্য। দাউদের ছোট ছোট দুই সন্তান সহ তাঁর স্ত্রী নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুবই আশঙ্কিত। জঙ্গিপুর পুলিশ সুপারকে লিখিত অভিযোগ করা হয় দাউদের পরিবারের পক্ষ থেকে। এসপি তাদেরকে তদন্তের আশ্বাস দিলেও সামসেরগঞ্জ থানা দাউদের পরিবারের কোন অভিযোগ গ্রহণ করেনি।

দাউদের পরিবার পরে জানতে পারে শামসেরগঞ্জ থানা দাউদকে ৩৪ নাম্বার জাতীয় সড়ক থেকে গ্রেফতার করেছিল। অথচ থানা দাউদের পরিবারকে গ্রেপ্তারের খবর, কোর্টে তোলার খবর এবং জেল হেফাজতের খবর, কিছুই দেয়নি। দাউদের পরিবার শামশেরগঞ্জ থানার কাছে কি কারণে দাউদকে গ্রেপ্তার করেছিল জানতে চাইলে কোনও কথা তাদের জানানো হয়নি। তাদেরকে দাউদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ -পত্রও দেওয়া হয়নি। গ্রেফতারের কোন অ্যারেস্ট মেমো পরিবারকে দেওয়া হয়নি। একটি ২৭ বছরের জীবন্ত ছেলেকে শামশেরগঞ্জ থানা গ্রেপ্তার করলো। পরিবার কোন খবর পেল না এবং কিছুদিন পর জঙ্গিপুর সাব জেল থেকে গলায় দাগ সহ তার মৃতদেহ বেরিয়ে এলো। দাউদের পোষ্টমর্টেমের সময়ও পরিবারের লোককে থাকতে দেওয়া হয়নি। বিষয়টি শামসেরগঞ্জ শাখার কাছে অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও সন্দেহজনক মনে হয়েছে। কেন দাউদকে গ্রেপ্তারকারী শামসেরগঞ্জ থানার নির্দিষ্ট অফিসার দাউদের পরিবারকে গ্রেপ্তার সম্পর্কে কিছু জানালো না? এই বেআইনি কাজটা তিনি কী-করে করলেন? জঙ্গিপুর সাবজেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পরিবারের পক্ষ থেকে করা দাউদের রহস্যজনক মৃত্যুর অভিযোগ কেন শামসেরগঞ্জ থানা গ্রহণ করলো না? কেন শামসেরগঞ্জ থানা দাউদকে কী অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল তার কোন প্রমাণ পত্র দাউদের পরিবারের হাতে দিলনা? কেন পোস্টমর্টেমের সময় দাউদের পরিবারের লোককে থাকতে দেওয়া হলো না? এই প্রশ্নগুলোর কোন সঠিক উত্তর দাউদের পরিবার বা এলাকাবাসী পায়নি। এই অবিচারের বিরুদ্ধে দাউদের পরিবার ও এলাকার মানুষ দাঁড়াতে চায়।

২৬ শে এপ্রিল ২০২৪ সকাল ১০-৩০ টায় দাউদের পরিবার সহ হাউসনগর গ্রামের যুবক, মহিলা বাচ্চা সহ সামশেরগঞ্জে একটি প্রতিবাদ মিছিল করে এপিডিআর শামসেরগঞ্জ শাখার উদ্যোগে। মিছিলের পর শামসেরগঞ্জ থানার ওসিকে নিম্নলিখিত দাবিতে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এলাকার বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম উপস্থিত ছিল। শামসেরগঞ্জ থানা ডেপুটেশনের প্রথম দাবি অনুযায়ী পরিবারের করা অভিযোগ পত্র কিছুতেই রিসিভ করতে চায় না। তখন সামশেরগঞ্জ শাখা, দাউদের পরিবার ও এলাকার মানুষ একসাথে থানাকে জানায়, যদি পরিবারের অভিযোগপত্র জমা না-নেওয়া হয় তাহলে থানা চত্বরেই মিছিলে আগত সমস্ত মানুষ সহ ওই সময় থেকেই ধর্নায় বসবে। পার্লামেন্টারী সাধারণ নির্বাচনের সময় সংবাদ মাধ্যমের সামনে থানা চত্বরেই এত মানুষ ধর্নায় বসবে শুনে পুলিশ ঘাবড়ে যায়। এলাকার জনসাধারণের চাপে পরিবারের অভিযোগ পত্র ও এপিডিআরের দাবি সনদ রিসিভ করে নিতে বাধ্য হয়। দাউদের

পরিবার, এলাকার মানুষ ও এপিডিআরের সদস্য মিলে দেওয়া ডেপুটেশনের সময় পুলিশ নিজেদের পক্ষে একটা কথাও বলতে পারেনি।

ডেপুটেশনের দাবিসনদ

১. শামসেরগঞ্জ থানাকে দাউদের পরিবারের পক্ষ থেকে করা অভিযোগ পত্র অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে ও জঙ্গিপুর উপ-জেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দাউদকে হত্যার মামলা রজু করতে হবে।

২. দাউদকে গ্রেফতারকারী শামশেরগঞ্জ থানার নির্দিষ্ট অফিসারকে অবিলম্বে সাসপেন্ড করতে হবে ও তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে।

৩. দাউদের পরিবারকে অবিলম্বে ন্যূনতম ১০ লাখ টাকা অন্তর্বর্তী ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ও পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি দিতে হবে।

৪. হাইকোর্টের বিচারপতিকে দিয়ে দাউদের অস্বাভাবিক মৃত্যুর বিচারবিভাগীয় তদন্ত করতে হবে।

এই ডেপুটেশনের পর থানা থেকে দাউদের পরিবারের লোকের সাথে যোগাযোগ করে। কিছু পরিমাণ টাকা নিয়ে সমস্ত বিষয়টা রফা করে নেওয়ার কথা বলে। দাউদের পরিবার থানার প্রস্তাব খারিজ করে দেয় ও রাজ্যের উচ্চ আদালতেই বিষয়টির সমাধান হবে বলে জানায়। কোর্টে যাওয়ার আগে দাউদের পরিবার নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর বিশেষ নজর দেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়।

১. জেল থেকে ৩০ শে এপ্রিল ২০২৪ দাউদের পরিবারকে যে ম্যাজিস্ট্রিয়াল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে তাতে দাউদের পরিবার অংশগ্রহণ করবে এবং পুরো অভিযোগটা জানাবে। অভিযোগ জানানোর পর যা লেখা হবে সেটা বাংলায় ভালো করে শুনে ও বুঝে সই করবে।

২. সামশেরগঞ্জ থানা পরিবারের দেওয়া অভিযোগপত্র অনুযায়ী একান্তই যদি এফআইআর করে মামলা রুজু না করে তাহলে এস পি-কে মামলা রুজু করার জন্য চাপ দেওয়া হবে।

৩. পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট তোলার জন্য এস পি-কে একটি চিঠি দেওয়া হবে।

৪. জেল হেফাজতে অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে পরিবারের যে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার আছে, সেই অনুযায়ী জেল কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানানো হবে।

৫. উচ্চ আদালতে যাওয়ার জন্য সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হবে।

তথ্যানুসন্ধান: শামসেরগঞ্জ শাখা

"তোদের আধার কার্ড ভুয়া। তোরা সবাই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। সি এ এ হয়েছে, এখন তোদের মেরে তাড়াবো।"

উড়িষ্যার ভদ্রকে মার খাওয়া শ্রমিকদের সাথে তথ্যানুসন্ধানে এপিডিআর শামসেরগঞ্জ শাখা

"সিএএ'র কারণে এবং বাঙালী হওয়ায়" উড়িষ্যার ভদ্রকে বেধড়ক মার খাওয়া মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জের ৩০ জন বাঙালি হকারদের সাথে এপিডিআর শামশেরগঞ্জ শাখার ৬ জনার একটি টিম মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সহ-সভাপতিকে সাথে নিয়ে তথ্যানুসন্ধানের জন্য দেখা করতে যায় গত ২রা এপ্রিল ২০২৪। ১০ জন হকারের সাথে তথ্যানুসন্ধানী দল কথা বলে। বাকি ২০ জন হকার বাইরে কাজে গিয়েছিল। বিষয়টিতে যারা ভিকটিম, তারা প্রত্যেকেই ওই এলাকায় আবার কাজ করতে যাবে বলে ভয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছিল। উড়িষ্যার ভদ্রকে হকারি করতে গিয়ে যে ৩০ জন মার খেয়েছিল তারা প্রত্যেকেই ধর্মে মুসলিম। সমস্ত হকারদেরই বাড়ি সামসেরগঞ্জ ব্লকের মহিষাস্থলি গ্রামে। গ্রামটিতে মুসলিম অধ্যুষিত পরিবারই সবথেকে বেশি। গ্রাম পঞ্চায়েত, দোগাছি নপাড়া। এরা সবাই উড়িষ্যার ভদ্রকে ঘরে ঘরে প্লাস্টিক, কাপড় ও বিভিন্ন রেডিমেড জিনিস হকারি করেন।

তারা বলেন, ঘটনাটি ঘটে ১৯ শে মার্চ ২০২৪ সকাল ছটায়। উড়িষ্যার ভদ্রকের গ্রাম চুনাপট্টি। এই গ্রামে বুলু সামন্তের বাউন্ডারি দেওয়া বাড়িতে বিভিন্ন ঘরে ৩০ জন হকার থাকে। উনিশে মার্চ, সকাল ৬ টার সময় ওই বাড়িতে একটা হামলা হয়। ক্রিকেটের ব্যাট উইকেট নিয়ে এলাকার কিছু লোক বাড়িতে ঢুকে সমস্ত হকারদের মারতে থাকে। দুজন গুরুতর আহত হয়। মারার সময় বলতে থাকে, "তোদের আধার কার্ড ভুয়া। তোরা সবাই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। সি এ এ হয়েছে, এখন তোদের মেরে তাড়াবো।" মারের পর বাড়ির মালিক একটি অ্যাম্বুলেন্স ডেকে সকলকে হাসপাতালে পাঠায়। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ভদ্রক রুরাল থানায় হকাররা ও এলাকার একজন, আনোয়ার মির (সাইকেল মিস্ত্রি) এফ আই আর করেন। থানার প্রটেকশনে বাঙালি হকাররা ট্রেন ধরে শামশেরগঞ্জে ফিরে আসে। এলাকার প্রত্যেকে সি এ এ বাতিল ও সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা দাবি করে। মহিষাস্থলী গ্রামের ৮৭ জনার একটি তালিকা এপিডিআর এর হাতে তুলে

দেয় গ্রামের হকাররা। এরা সকলেই উড়িষ্যার ভদ্রকে কাজ করে। এদের সকলেরই নিরাপত্তা সরকারের কাছে দাবি করে মহিষাস্থলি গ্রামবাসী। প্রত্যেকটি হকারই জানায়, এর আগে ওই এলাকাবাসীর সাথে কোন ঝামেলাতেই এরা জড়ায়নি। রোজা চলছে বলে মহিলারা বাইরে আসেননি।

এই ঘটনাটার ক্ষেত্রে তথ্যানুসন্ধান দলটির নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও দাবি

১. সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। রাজ্য সরকারকে এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে রাজ্যের শ্রমিক ও হকারদের হেনস্থা না-হয়।

২. 'বাঙালি অনুপ্রবেশকারী' তকমা নির্দিষ্টভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসক দল বিজেপির একটি চক্রান্ত। তারা আদতে সমস্ত বাঙালির বিরুদ্ধে এই তকমা প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে। তাই অবিলম্বে এই তকমা যারা দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩. এই সমস্ত কিছুর মূলে আছে সি এ এ (নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন) ২০০৩, ২০১৯ এবং ২০২৪ এর রুলস। অবিলম্বে এই সি এ এ, এনপিআর, এনআরসি বাতিল করতে হবে।

তথ্যানুসন্ধানের পর শামসেরগঞ্জ এলাকাতেই এপিডিআর সামসেরগঞ্জ শাখা, ঐদিনই একটি প্রেস কনফারেন্স করে উক্ত দাবিগুলো তুলে ধরে।

তথ্যানুসন্ধান: মহেষতলা-মেটিয়াবুরুজ শাখা

১৭-০৩-২০২৪, রবিবার, গার্ডেনরীচে ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে একদম ঘিঞ্জি একটি গলির মধ্যে একটি পাঁচতলা বাড়ির অবৈধ নির্মাণ হচ্ছিল। সে'টি রবিবার রাতে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। আশে-পাশে ছোট ছোট টালির চালের কিছু বাড়ি ছিল। নবনির্মিত বাড়িটি ঐ ছোট বাড়িগুলির ওপরে ভেঙে পড়ে। আমরা মঙ্গলবার, ১৯-৩-২০২৪, মেটিয়াবুরুজ মহেশতলা এপিডিআর শাখার পক্ষ থেকে ঐ স্থানে ছয় জনের একটি দল তথ্যানুসন্ধানে যায়। ঐখানে গিয়ে দেখা যায় প্রচুর পুলিশ বাড়িটিতে যাওয়ার যতগুলি গলি আছে সব ব্যারিকেড করে ঘিরে রেখেছে। কোথাও ঢুকতে দিচ্ছে না। আমাদের দুজনকে পুলিশ সঙ্গে করে নিয়ে দেখিয়ে এনেছে। পুরো বাড়িটি ধ্বংসস্তূপ এ পরিণত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত আমরা খবর পেয়েছি নয় জন মারা গেছেন প্রায় পনের জন আহত। তারমধ্যে তিনজন পিজি হাসপাতালে ভর্তি আছেন।বাকি সবাই গার্ডেনরীচ উইপন হাসপাতালে আছেন এবং নয়জন মৃত ব্যাক্তি ও ঐ উইপন হাসপাতালে ছিলেন।

আমরা যখন যাই তখন উইপন হাসপাতালে দু'জন মৃত ব্যাক্তি ছিলেন। আমরা গার্ডেনরীচ থানার ও সি র সাথে কথা বলেছি। ওনার কথায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভেঙে যাওয়া বাড়ির বাকি মানুষ-জনের থাকা কিম্বা অন্য কোনও ব্যাবস্থা করা হয়নি। তবে তারা আশেপাশের আত্মীয়দের বাড়িতে আছেন। এখন ধ্বংস স্তুপ পরিস্কার করা হচ্ছে। মনে হচ্ছে, ঐ ধ্বংস স্তুপের মধ্যে এখনও মৃতদেহ আছে। কিন্তু ঐ ছোট জায়গায় ঐ সমস্ত ভাঙাচোরা জিনিস কোথায় ফেলা হচ্ছে বোঝা গেল না। পুলিশ এর থেকে বেশী কিছু বলল না। তবে সেখানে পার্টির দাদাদের যথেষ্ট তৎপরতা দেখা গেছে।সেই তথাকথিত দাদারা কোথাও গেলে তেড়ে আসছে। কারও সঙ্গে কথা বলতে দিচ্ছে না। মহম্মদ আমীর বলে একজনের সঙ্গে কথা বললাম। তার ভাই মহম্মদ ইমরান এই দুর্ঘটনায় মারা গেছে। তার ১৭ বছর বয়স। বাড়িতে মা,বাবা,বোন আছে। কিন্তু কথা বলতে-বলতেই বেশ কিছু ষন্ডাগুন্ডা মানুষ প্রায় আমাদের ঘিরে ধরে বলতে থাকে কী-জন্য এসেছেন আপনারা; এই মৃত মানুষের ফিরাতে পারবেন? এই বলে আমীরকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। যেখানেই যাওয়া হচ্ছে সেখানেই একগাদা লোক ঘিরে ধরে কাজে বাধা দিচ্ছে। ওখানকার স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে জানলাম ঐ বাড়িটি একটি পুকুর বুজিয়ে করা হয়েছে। স্থানীয় মানুষজনের কথায় আমরা ভয়ে কিছু বলি না। এখানে কোনও কথা বলা যায় না।বললে মারাত্মক বিপদ এমন-কী প্রাণহানি ও হতে পারে।

সমস্ত মেটিয়াবুরুজ, মহেশতলা,গার্ডেনরীচ এলাকায় যত্র-তত্র পুকুর বোজানো, অবৈধ বাড়ি কোন পারমিশন ছাড়া কখনও টাকা দিয়ে পারমিশন নিয়ে বাড়ি নির্মাণ করা হয়। এখানে কোন কথা বলা যায় না। কোনও প্রতিবাদ করলে বিপদে পড়তে হয়। বিভিন্ন কারণে পিটিয়ে মারার ঘটনা ও মেটিয়াবুরুজে চলে। প্রশাসনের কাছে প্রশ্ন শুধু পাঁচ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিলে সব প্রয়োজন মিটে যায়? দুর্ঘটনা ঘটলে নেতা-মন্ত্রীর আনাগোনা বাড়ে প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে যায়। কিন্তু দুর্নীতি বন্ধ হয় না কেন? স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন এর কাছে দাবি—

১) অবৈধ নির্মাণ বন্ধ হোক।

২) পুকুর, জলাশয় বোজানো বন্ধ হোক।

৩) খুব সামান্য কারণে পিটিয়ে মারা বন্ধ হোক।

৪) ক্ষমতা আর অর্থ দিয়ে আকছার অপরাধ করা বন্ধ হোক।

৫) সমস্ত ছোট দরজি ভাইদের প্রতি নজর দেওয়া হোক, তাদের কাজের সুবিধা করে দেওয়া হোক। আর অহেতুক প্রশাসনের অঙ্গুলি হেলন বন্ধ হোক।

এপিডিআর, মেটিয়াবুরুজ-মহেশতলা শাখা, এপিডিআর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটি।

তথ্যানুসন্ধান: কৃষ্ণনগর শাখা

চিত্রশালী তেঘরিয়া পঞ্চায়েত-এর বাগদি পাড়া দীর্ঘদিন ধরে একটি মদের দোকানকে ঘিরে জনরোষে ফুঁসছে। গ্রামবাসীদের প্রবল আপত্তিতে আপাতত কিছুদিন মদের দোকানটি বন্ধ হয়ে থাকলেও দোকানটি আবার খুলতে দেওয়ার জন্য মালিক চাপ সৃষ্টি করছে এমন-কী পুলিশ প্রসাশন ও আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরাও গ্রামে এসে গ্রামবাসীদের দোকান খুলতে দেওয়ার ‘ অনুরোধ’ করছে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ পেয়ে ১৭-০৩-২৪ তারিখে APDR তথ্যানুসন্ধানে গেলে দোগাছি, তেঘরিয়া বাগদিপাড়ার শতাধিক মহিলা ভিড় করে আসেন এবং তাদের বিক্ষোভ উগড়ে দেন।প্রধানত যে অভিযোগ গুলি উঠে আসে—

১) বিক্রয় কাউন্টারের ৩০০মিটারের মধ্যে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় (চিত্র শালী কুঠির পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়) ও একটি উচ্চ বিদ্যালয় (চিত্রশালী হাই স্কুল) এবং গ্রামের মন্দির থাকা সত্বেও মদের দোকানটি সরকারি আবগারি দপ্তরের লাইসেন্স পেয়েছে ও চলছে।

২) মদের দোকানের মালিক শ্যাম সাহা এই গ্রামের বাসিন্দা নন, কোনও আপত্তিতে কান না দিয়ে বাইরে থেকে লোক পাঠিয়ে তিনি দোকান খোলান ও গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ করলে হুমকি দেন।

৩) ২/১২/২০২৩ তারিখে ওই মদের দোকানের মধ্যেই তেঘরিয়া পাড়ার এক যুবককে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

৪) বাইরে থেকে আসা নেশাগ্রস্ত লোকেরা মহিলাদের উত্যক্ত করে এমন-কী শারীরিক হেনস্থার অভিযোগ ও অনেকে করলেন।

৫) গ্রামের মহিলারা সংলগ্ন পুকুরটিতে স্নান করতে যেতে, মদের দোকানের সামনে দিয়ে গ্রামে ঢোকার রাস্তায় যাতায়াত করতে এমন-কী ছাত্রীরা ওই পথে স্কুলে যেতেও ভয় পায়।

৬) মহিলাদের অভিযোগ ওই মদের দোকান চলায় প্রতি সংসারে নিত্য অশান্তি লেগে আছে। কারণ, গ্রামের পুরুষদের অনেকেরই নেশাগ্রস্ততা বাড়ছে, সামান্য উপার্জন ও নেশায় উড়িয়ে দেওয়া বাড়ছে, এমন-কী স্কুল ছুট ছোট ছোট কিশোররা ওই মদের দোকান কে ঘিরে খালি বোতল ছিপি বিক্রি, নেশারুদের ফাই-ফরমায়েশ খেটে সহজে কিছু রোজগার করায় জড়িয়ে পড়ছে।

৭) মালিক শ্যাম সাহা ‘প্রভাবশালী’ বলেই প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি, মদের দোকান স্থানান্তরিত হয়নি।

৮) ইতি মধ্যেই গ্রামবাসীরা নদীয়া জেলা শাসক, আবগারি দপ্তরের নদীয়া জেলার কর্মাধ্যক্ষ , IC কোতোয়ালিকে মদের দোকানটি বন্ধ করার দাবী জানিয়ে গণস্বাক্ষরসহ আবেদন পত্র জমা দিয়েছেন।

এলাকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের ও তারা জানিয়েছেন।

১৯ শে মার্চ, কৃষ্ণনগর শাখার পক্ষ থেকে তথ্যানুন্ধানে গেলে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির সদস্যদের তারা জানান অবিলম্বে মদের দোকানটি বন্ধ করা না হলে এবং গ্রামের মহিলাদের সামাজিক সুরক্ষা নিরাপত্তার ব্যবস্থা না পেলে তারা প্রতিবাদ স্বরূপ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভোট দান থেকে বিরত থাকবেন।

এই তথ্যানুসন্ধানের পর, ২১ শে মার্চ ঐ গ্রামের দুশো জন মহিলার একটি মিছিল ও থানা ডেপুটেশনের উদ্যোগ নেয় শাখা ।মহিলাদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে মদের দোকানের মালিক ও তার ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও গ্রেফতারের দাবি জানানো হয় কোতয়ালী থানায়।

তথ্যানুসন্ধান দলে ছিলেন, তাপস চক্রবর্তী, রীতা দে, অমিতাভ ও মৌতুলি।

তথ্যানুসন্ধান ২

নদীয়ার চাপড়া থানার মহৎপুর পঞ্চায়েতের তিলকপুর গ্রামের কাছে- জলঙ্গীর নদীর বুকে অবৈধ ভাবে মাটি কাটা

চলছে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের বক্তব্য নদীর পাড় থেকে জেসিপি নামিয়ে সরকারি খাস জমির মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে স্থানীয় ইঁট ভাটা মালিকের লোক। এর ফলে জলঙ্গী নদী-তো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেই, এর পাশাপাশি কম-বেশি প্রায় ১০০জন চাষীর চাষবাসও বন্ধ হওয়ার মুখে। সবচেয়ে মারাত্মক বিষয়, এমন-কী এই 'মাটি মাফিয়া'রা রেয়াত করছে না, নদী পাড়ের বাঁধটিকেও। গ্রামবাসীদের অভিযোগ বেশ কিছুদিন ধরেই এই কারণেই তেম'নি থেকে হরেকালিচরের সংলগ্ন নদী বাঁধ এভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এর আগে শ্রীকৃষ্ণপুরের চর থেকেও মাটি কাটা হয়েছে। অভিযোগে উঠেছে স্থানীয় ডন ইঁট ভাটা ও সোনা ইঁট ভাটার মালিকদের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি তিলকপুরের বাঁধের গায়ে দেড়-দু বিঘা নদী কিনারায় এমন মাটি কাটার খবর ঝুঁকি নিয়ে করতে গিয়ে হুমকির মুখে পড়েন এক সংবাদ প্রতিনিধি। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রচারিত এই খবরে দেখা যায়, ভাটা মালিক ও শাসক দলের যোগসাজশে এমন ভাবে মাটি কাটা চলছে বলে অভিযোগ করছেন গ্রামবাসীরা। এবারে মিডিয়ায় 'খবর' হয়ে যাওয়ায় তড়িঘড়ি চাপড়া থানার পুলিশ এসে কয়েকটি মাটি কাটা মেশিন আটক করলেও ক'দিন পরে আবার 'যে কে সেই'। মিডিয়ার প্রশ্নের মুখে প্রশাসনের তরফে সদুত্তর দিতে পারেননি BLRO। আজ ,১৪..৪.২৪ তারিখে APDR এই বিষয়ে তথ্যানুন্ধানে যায়। APDR কর্মীদের সামনেই নদী বাঁধের ১০০মিটারের মধ্যেই মাটি কাটার কাজ চলছিল। তথ্যানুসন্ধানে উঠে এলো মহতপুর-তিলকপুরের কৃষক ও গ্রামবাসীদের রাশি রাশি অভিযোগ। তারা বললেন—এর আগেও প্রতিবাদ করে জুটেছে ভাটা মালিকদের হুমকি আর প্রশাসন থেকেছে নির্বিকার। গত দু' হাজার সালের বন্যার স্মৃতি তাদের বাঁধের পরিণতি নিয়ে আরও আতঙ্কিত করে তুলছে। ইট ভাটা চলছে, পরিবেশ ও নদী আইন কে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চলছে বেআইনি মাটি লুঠ, শাসক দলের তর্জনীতে প্রশাসন 'দেখেও দেখেনা', টিটু, কুমারী ভট্ট দের মতো ভাটা মালিকরা বেপরোয়া আর জমি হারাচ্ছেন কৃষকরা। তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঢলছে নদীয়ার প্রাণের ধারা জলঙ্গী।

এই তথ্যানুসন্ধানের পর এলাকায় জানাজানি হলে মাটি কাটার সময় বদল হয় মাত্র। দুপুরের পরিবর্তে রাতের অন্ধকারে চলছে মাটি কাটা। ইতিমধ্যে, ভাটা মালিক এপিডি আর এর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা ও করে। কৃষকদের দারিদ্র কে হাতিয়ার করে ভাটা মালিকরা একের পর এক কৃষিজমি কিনে নিচ্ছে কৃষকদের থেকে। বিক্রিত জমিতে কুড়ি থেকে তিরিশ ফুট মাটি কাটা হয় বলে জমি দিতে অনিচ্ছুক কৃষকদের জমির আল সরে যাচ্ছে

ফলত তারা ও চাষ করতে পারছেন না। বিশাল কৃষিজমি এভাবেই বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন কৃষকরা। কৃষিজমিতে আর ফসল ফলবে না, ঐ মাটি দিয়ে ইঁট তৈরি হলে অন্ন সংস্থান হবে কিভাবে আমাদের? এই প্রশ্ন ই উঠে আসছে বারবার। এই বিষয়ে দ্বিতীয়দিন তথ্যানুসন্ধানে যাওয়া হয়। কৃষকদের সাথে সংযোগ তৈরি করতে আরও অনেকবারই যেতে হবে এবং মাটি কাটা বন্ধের দাবিতে জোরালো আওয়াজ তুলতে হবে।

তথ্যানুসন্ধান করেন - অমিতাভ ও মৌতুলি

অন্যান্য কর্মসূচী

১) ২৩শে মার্চ 'আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস' পালন করতে একটি আলোচনা সভা করা হয়। শ্রমজীবী মহিলাদের শ্রম আর মজুরির অধিকার কতটা সুরক্ষিত? বিভিন্ন আঙ্গিকে এই বিষয়ে আলোচনা করেন অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী, সমাজ কর্মী থেকে শুরু করে গবেষক ও আন্দোলনকর্মীরা, যার মধ্যে উল্লেখজনক ছিলেন চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়, বেলা আদক ও ধীমান বসাক।

২) সি এ এ ২০১৯ বাতিলের দাবিতে শাখার পক্ষ থেকে পোষ্টার, লিফলেটিং সহ পাড়ায়- পাড়ায় ছোট-ছোট পথসভা করা হয় এবং তা' ধারাবাহিকভাবে চলছে । এ যাবৎ মোট ছয়টি সভা হয়েছে। পাশাপাশি, জেলাব্যপী সি এ এ বাতিলের দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এন আর সি বিরোধী সমন্বয় মঞ্চ নামে একটি যৌথ মঞ্চ গঠন করা হয় কৃষ্ণনগর শাখার পক্ষ থেকে। যার প্রথম কর্মসূচী হিসেবে ৩ রা এপ্রিলএকটি যৌথ পথসভা হয়।

৩) এপ্রিল মাসের চার তারিখ শহরের সাফাই কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবিতে হরিজন পাড়ায় পোষ্টারিং করা হয় ।

৪) ৭ ই এপ্রিল সি এ এ বাতিলের প্রশ্নে মতুয়া সমাজের অবস্থান জানতে ও বুঝতে একটি আলোচনা সভা করা হয়। মুখ্য আলোচক ছিলেন শরদিন্দু বিশ্বাস।

৫) ১৩ ই এপ্রিল কৃষ্ণনগর শাখার ২৯ তম (ত্রয়োদশ দ্বিবার্ষিক) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নুড়ি পাড়া কমিউনিটি লজে। ঐ দিন ই রাত বারোটা থেকে শহরের বিভিন্ন রাস্তায়, দেওয়ালে সি এ এ বাতিলের দাবিতে পোষ্টার লাগানো হয়।

তথ্যানুসন্ধান: বাদকুল্লা, তাহেরপুর, বীরনগর, কৃষ্ণনগর শাখা

বিন্দু বিশ্বাস ১৫, (নাম পরিবর্তিত) , মা- প্রভাতী বিশ্বাস (নাম পরিবর্তিত)

অভিযুক্ত—রিন্টু বিশ্বাস ১৯ , বাবা- অর্জুন বিশ্বাস।

২৫-০৩-২৪ তারখ, সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ বাদকুল্লার আরবান্দি (দক্ষিণ) , থানা , শান্তিপুর, নদিয়া। রিন্টু, বিন্দুদের বাড়ি এসে বিন্দু কে ডাকে। ঐ সময় প্রভাতী বিশ্বাস বাড়িতে ছিলেন না। রিন্টু ও বিন্দু পূর্ব পরিচিত হওয়ায় তার ডাকে তার কাছে যায় এবং রিন্টু তাকে রং খেলার কথা বলে। গ্রামে সবার সামনে খেলতে অস্বস্তি হচ্ছে বলে বিন্দুকে তাদের গোয়ালঘরের ভেতরে খেলবে বলে জানায়। বিন্দু গোয়াল ঘরের কাছে গেলে তার হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে যায় এবং রং খেলার অছিলায় তাকে ধর্ষণ করে। বিন্দু চিৎকার করলে রিন্টু ওর মুখে হাত চেপে ধরে। ধর্ষণ করে রিন্টু চলে গেলে মেয়েটি গোঁগাতে থাকে। মিনিট কুড়ি পর প্রভাতী দেবী বাড়ি ফিরলে মেয়েটি তাকে সব কথা খুলে বলে। ঐ অবস্থায় তখন তার রক্তপাত হচ্ছিল। প্রভাতী দেবী সঙ্গে সঙ্গে থানায় অভিযোগ করেন এবং মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালে যান। পরের দিন তাকে কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে আনা হয়। এখন সে চিকিৎসাধীন ।প্রভাতী দেবী জানান, প্রচুর রক্তপাত হওয়ার কারণে তাকে দুই দিনে দুই ইউনিট রক্ত দিতে হয়েছে। তার যোনিতে দশটিরও বেশি সেলাই পরেছে। অক্সিজেন ও সেলাইন চলছে । মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পরেছে তার মেয়ে। শান্তিপুর থানা এফ আই আর করেছে এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যদি ও এখনো পর্যন্ত ফরেন্সিক পরীক্ষা করা হয়নি। ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য আই ও মনিরুল জামাল কে এপিডি আর এর পক্ষ থেকে বলা হলে তিনি জানান তার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অসুস্থতার কারণে ১৬৪ ধারা করা ও সম্ভব হয়নি ।

প্রভাতী দেবীর স্বামী মৃত। এই ঘটনায় তিনি অভিযুক্তের শাস্তি দাবি করছেন। এপিডিআর-এর তথ্যানুসন্ধানী দল গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলে জানতে পারেন, অভিযুক্ত রিন্টু বিশ্বাস এর আগে ও নানা অপরাধের সাথে যুক্ত ছিল। বন্ধুদের সাথে মদ খেতে গিয়ে ভাঙা কাঁচের বোতল এক বন্ধুর পেটে ঢুকিয়ে দেয়। সেবার ও তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করা হয়। কিন্তু বাবা অর্জুন বিশ্বাস, শাসকদলের নেতৃত্বে থাকার সুবাদে নিজের প্রভাব খাটিয়ে ছেলের বিরুদ্ধে আসা অভিযোগকে অভিযোগকারীর সাথে আপোষ করে দেন। সমস্যা থেকেই যায়। রিন্টু ক্ষমতার ভাষা শিখে নেয় খুব অল্প বয়সেই। এই শিক্ষাই তাকে লুম্পেনগিরির পক্ষে সাহস জোগায়। যার পরিণতি তে ধর্ষণের মতো অপরাধ করতে ও তার বাধেনা। শাসকের ক্ষমতা, পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষমতা বার বার সমাজে ধর্ষক তৈরি করে। এপিডি আর এর পক্ষ থেকে অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে প্রভাতী দেবীর লড়াইয়ের পাশে শেষ পর্যন্ত থাকার কথা বলা হয়। ধর্ষণ এবং ধর্ষণকামীতার বিরুদ্ধে এই লড়াই শুধু মাত্র ধর্ষকের বিরুদ্ধে নয়, যে ক্ষমতা ধর্ষণের সাহস জোগায় সেই ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াই ও এই লড়াইয়ের বর্শামুখ হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

তথ্যানুসন্ধান করা হয় বাদকুল্লা তাহেররপুর বীরনগর ও কৃষ্ণনগর শাখার পক্ষ থেকে। তথ্যানুসন্ধান দলে থাকেন ভূপতি ঘোষ, সমর চক্রবর্তী, রীতা দে, মৌতুলি নাগ সরকার।

রিপোর্ট

রিপোর্ট: মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি শাখার সম্মেলন

১৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ রবিবার কান্দি শাখার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো কান্দিতে। সংগঠনের কান্দি শাখা দীর্ঘ সময় থেকেই একদম নিষ্ক্রিয়। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে জনসাধারণের পাশে দাঁড়াতে কান্দি শাখার ভূমিকা বহুদিন থেকেই একেবারে বন্ধ। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় কান্দি শাখাকে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে এই সম্মেলন।

কান্দি শাখার সভাপতি সহ তিনজনের সভাপতি মন্ডলীকে সম্মেলন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। শুরুতেই এলাকার শ্রমজীবী যুবক সাধন দাস এর অসাধারণ গণসঙ্গীত দিয়ে সভা পরিচালনার কাজ শুরু হয়। সম্মেলনে ৩০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে। শাখার সভাপতি সম্মেলনের আহ্বায়ক হিসাবে প্রতিবেদন পাঠ করে। প্রতিবেদনের ওপর আলোচনায় শাখার পক্ষ থেকে ৯ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রত্যেকের আলোচনাতেই শাখাকে সুসংগঠিত করা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী বাস্তবসম্মত কর্মসূচির বিষয়গুলি প্রাধান্য পায়। মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সম্পাদক গোলাম মোঃ আজাদ, সহ-সভাপতি হামিদ সরকার ও রাহুল চক্রবর্তী অধিকার আন্দোলনে জেলার সার্বিক অবস্থা তুলে ধরেণ। কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর পক্ষ থেকে সহ-সম্পাদক মৌতুলি নাগ

সরকার বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলায় সংগঠনের ভূমিকা বিষয়ক একটি গঠনমূলক প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন ও কান্দি শাখার প্রতিটি সদস্যকে মালদার কেন্দ্রীয় সম্মেলনে আসার আহ্বান করেন। সম্মেলনের শেষে শাখার সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ সহ তের জনের কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত হয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে কান্দির অত্যন্ত পরিচিত নাগরিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীকে নিয়ে দুইজনার একটি উপদেষ্টা মন্ডলী তৈরি হয়।

রিপোর্ট: শিকারপুর শাখা

মৎসজীবীদের মাছ ধরার অধিকারের দাবিতে সরব শিকারপুর শাখা

শিকারপুরে মাথাভাঙা নদীতে মৎস্যজীবীদের দীর্ঘ চার বছর ধরে নামতে দিচ্ছে না বি এস এফ। বন্ধ হয়ে গেছে মৎসজীবীদের রুটি রুজি। ১৫০ টি মৎসজীবী পরিবার আজ এই অনিশ্চয়তায় ধুঁকছেন। মৎসজীবীরা নিজেদের স্থায়ী জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়ে পরিণত হয়েছেন দিনমজুরে। যাতে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে জীবিকা এবং জীবনের প্রশ্নও।

দীর্ঘদিনের এই সমস্যা নিয়ে মৎসজীবীরা এপিডিআর, শিকারপুর শাখার কাছে সহযোগিতা চাইতে আসলে শাখার পক্ষ থেকে তাদের কথা বিস্তারিত শোনার পরে ০২-০৫-২৪ তারিখে বি এস এফ ৮৬ নং ব্যাটেলিয়নে মাথাভাঙা নদীতে মাছ ধরার দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বারুইপাড়ার প্রায় পঞ্চাশ জন মৎসজীবী মিছিল করে বি এস এফ এর কাছে যান। প্ল্যাকার্ড জুড়ে দাবি তোলেন, মাথাভাঙা নদীতে মৎস্যজীবীদের অবাধে মাছ ধরতে দিতে হবে। চোরাচালানকারী সন্দেহে কোন ও মৎসজীবীকে নদীতে নামতে বাধা দেওয়া যাবে না। এপিডিআর শিকারপুর শাখা, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলী প্রতিনিধি এবং মৎসজীবীদের সাথে বি এস এফ কোম্পানী কম্যান্ডান্ট ও সেকেন্ড কমান্ডান্টের সাথে দীর্ঘ একঘন্টা আলোচনা চলে। কোনও অবস্থাতেই এমন-কী নিরাপত্তার অজুহাতে ও নদীর ওপর মৎসজীবীদের অধিকার কেড়ে নেওয়া যাবে না। এপিডিআর-এর পক্ষ থেকে এই কথা দৃঢ়ভাবে দাবি করা হলে বি এস এফেরপক্ষ থেকে জানানো হয়, নির্বাচনের পরে এই বিষয়ে তারা এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করবেন। প্রসঙ্গত, শিকারপুরে মৎসজীবীদের বঞ্চনা রয়েছে সমস্ত প্রশাসনিক স্তরে। বিশেষত, বিডিও অফিস থেকে কোনও রকম সরকারি সাহায্য উপভোগ করতে পারেন না বলে জানান তারা। মৎসজীবীদের নামে আসা সরকারিভাবে জাল, মাছের চারা, সাইকেল, বটি এমনকি অনুদান ও বিডিও অফিস থেকে ই উধাও হয়ে যায়। সরকারি পুকুরে মাছ চাষ করতে পারেননা মৎস্যজীবীরা। এককথায় নিজের জীবিকা থেকে উৎখাত করার সমস্ত ব্যবস্থাই প্রশাসনিক তরফে বন্দোবস্ত করা আছে। যা নেই, তা হল জীবন জীবিকার অধিকার! মাছ ধরার অধিকার! যদিও সমস্ত মৎস্যজীবীরাই পঞ্চায়েতের সার্টিফিকেট ও মৎস্যজীবী কার্ড আছে । এপিডি আর এর কাছে তারা প্রশ্ন রাখেন, ‘‘মৎস্যজীবী কার্ড থেকেও যদি আমরা মাছ ধরতে না-পারি তাহলে আর কার্ডের গুরুত্ব কী?’’ এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা অত্যন্ত জরুরী এবং মৎস্যজীবীদের অধিকারের পক্ষে আওয়াজ তোলা, লড়াই আন্দোলন গড়ে তোলাই একমাত্র সমাধান বলে মনে করছে এপিডি আর। এই লড়াই চলবে যতক্ষণ না দাবিপূরণ হয়। পাশাপাশি, এই লড়াইয়ে শিকারপুরের সমস্ত মৎস্যজীবীদের সংগঠিত হওয়ার আবেদন রাখে এপিডি আর ।

কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ সম্পাদক রাহুল চক্রবর্তী ও মৌতুলি নাগ সরকার। শিকারপুর শাখার সম্পাদক অনুপ মন্ডল মৎস্যজীবীদের সংগঠিত লড়াই গড়ে তোলার পক্ষে দৃঢ় ভূমিকা রাখার কথা জানান।

রিপোর্ট: পানিহাটি শাখা

৫ই নভেম্বর ২০২৩ তারিখে পানিহাটি শাখার উদ্যোগে প্যালেস্টাইনের উপর ইজরায়েলের বর্বরোচিত আক্রমণের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে এবং প্যালেস্টাইনের জনগণের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে পানিহাটি অঞ্চল জুড়ে শাখার পক্ষ থেকে ১৫০টি হাতে লেখা পোস্টার লাগানো হয়। সাধারণ মানুষ এই উদ্যোগকে যুক্তিপূর্ণ ভাবে সমর্থন জানান।

সোদপুর দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যাপীঠে ৩০শে ডিসেম্বর ২৩-এ অনুষ্ঠিত হলো এপিডিআর পানিহাটি শাখা আয়োজিত সেমিনার।

বিষয় : ধর্ম, ইতিহাস ও বাস্তবতা

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শাখার সভাপতিও মানবাধিকার আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা শ্রী ধীরাজ সেনগুপ্ত, শাখার কার্যকরী সভাপতি মানবাধিকার কর্মী সাথী অধ্যাপক

গুরুপ্রসাদ কর, মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার আন্দোলনের সুপরিচিত মুখ সাথী অধ্যাপক সুজাত ভদ্র, বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও অনীক পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক অধ্যাপক শুভাশিস মুখোপাধ্যায় ।

আলোচনার পরে চলে প্রশ্নোত্তর পর্ব। সবার শেষে দেখানো হয় একটি তথ্যচিত্র। প্যালেস্টাইনের সাধারণ নাগরিকদের উপর ইজরায়েলের নৃশংসতম আক্রমণের এক জীবন্ত দলিল, Where should the birds fly? তথ্যচিত্রটি প্রদর্শন করেন People's Film Collective-এর পক্ষে সাথী দ্বৈপায়ন বন্দোপাধ্যায়। বক্তাদের তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা, ইতিহাস নির্ভর বিশ্লেষণ এবং ডকুমেন্টারির মাধ্যমে ইহুদি আধিপত্যবাদের ভয়ংকর আগ্রাসন প্রত্যক্ষ করায় সেমিনার শুধু প্রাণবন্তই হয়ে ওঠেনি, উপস্থিত হল ভর্তি শ্রোতাদের মুখে এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফুটে উঠেছিল দৃপ্ত প্রতিবাদের জ্যামিতি। এক কথায় সেমিনার আলোচনা সভার সীমানা ছাড়িয়ে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের সফল চেহারা নিয়েছিলো। উপস্থিত শ্রোতাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানানো হয় ।

নদী বাঁচান, জীবন বাঁচান

'নদীর মেয়ে' সুদেষ্ণা পাল কর, গঙ্গা সহ দেশের ছোট-বড় নদী, জলাশয় বাঁচানোর দাবি নিয়ে গত ২৮শে নভেম্বর ২০২৩ মুর্শিদাবাদের আহিরণ ঘাট থেকে যাত্রা শুরু করে গঙ্গাবক্ষে একক কায়াকিং অভিযান করে আজ ১২ই ডিসেম্বর ২০২৩ বিকেলে কলকাতার প্রিন্সেপ ঘাটে পৌঁছেছে। Walk আয়োজিত এই অভিযানে সুদেষ্ণাকে সঙ্গ দিতে একটি নৌকায় রয়েছেন আরও ৮ জন পরিবেশ যোদ্ধা। এই দীর্ঘ ৪০০ কিমি পথে গঙ্গার দূষণ,ভাঙন, নদীজীবি মানুষের দুর্দশা তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন। যাত্রাপথে বিভিন্ন ঘাটে নেমে তাঁদের অভিজ্ঞতা সাধারণ মানুষের কাছে বর্ণনা করেছেন। এবং নদী ও জলাশয় বাঁচানোর লড়াইয়ে সামিল হওয়ার জন্য ও গঙ্গা সহ দেশের নদীগুলোর দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন নদীতীরবর্তী মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন।

১২ই ডিসেম্বর ২৩ সকাল ৮টায় এপিডিআর পানিহাটি শাখার উদ্যোগে পানিহাটির ঐতিহাসিক মহোৎসবতলা ঘাটে গঙ্গার দূষণ রোধ, গঙ্গাবক্ষে পৌরসভার সংগৃহীত দৈনন্দিন বর্জ্য ও কলকারখানার ভয়ংকর দূষিত বর্জ্য পদার্থ ফেলা অবিলম্বে বন্ধ করার দাবিতে অবস্থান হয়। সেই সভাস্থলে পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের এই সাহসী অভিযাত্রী ও ঢঞ্জক্ত-এর সদস্যদের এপিডিআর কুর্নিশ জানায়। সুদেষ্ণা তাঁর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। এপিডিআর-পানিহাটি শাখার পক্ষে তুফান চক্রবর্তী,শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব ঘোষ, বিশ্বনাথ দাস প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভা থেকে গঙ্গার দূষণ রোধে পানিহাটি পৌরসভার দ্রুত হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়। সভাস্থলে সুদেষ্ণা ও তাঁর সাথীদের এই অভিযানকে প্রত্যক্ষ করতে ও এপিডিআরের দাবির সমর্থনে সাধারণ মানুষ স্বতস্ফুর্তভাবে সভাস্থলে ভিড় জমায়।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস (১০ই ডিসেম্বর) উপলক্ষে এপিডিআর পানিহাটি শাখা ১৬ই ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে ভ্রাম্যমান কর্মসূচি পালন করে। পানিহাটি পৌরসভা প্রাঙ্গণ, বিবির বাগান, মোল্লার হাট, আগরপাড়া তেঁতুলতলা, মহাজাতির মোড়, লাহাবাগান, উষুমপুর এবং ঘোলার মোড়ে সংক্ষিপ্ত পথসভা হয়। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি, বনাঞ্চল সংরক্ষণ আইন ২৩ এবং প্রস্তাবিত দন্ড সংহিতার মতো জনবিরোধী আইন, লোভের কবলে পরিবেশের বিপন্নতা ও সর্বোপরি সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের মতো মানবাধিকারের বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে বক্তারা তুলে ধরেন এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। একটি প্রাসঙ্গিক প্রচারপত্রও বিলি করা হয় ।

সোদপুরের ঘোলায় জগদ্ধাত্রীপুজো উপলক্ষে এপিডিআর পানিহাটি শাখার আয়োজনে ২১-১১-২৩ থেকে ২৪-১১-২৩ পর্যন্ত বইয়ের আসর বসেছিল । পাঠকদের পক্ষ থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে। প্রতিদিন স্বতস্ফূর্ত পাঠক সমাবেশ হয়েছে। ভালো বইয়ের সম্ভার থেকে তাঁরা তাঁদের প্রিয় বইটি সংগ্রহ করেছেন।

প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করো

১২ ই নভেম্বর ২৩ তারিখে (কালীপুজোর দিন সকালে) এপিডিআর পানিহাটি শাখা, সোদপুর বিজ্ঞান চেতনা এবং আহ্বান সাংস্কৃতিক সংস্থার সম্মিলিত উদ্যোগে প্যালেস্টাইনের উপর ইজরায়েলের বর্বরোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে এবং প্যালেস্টাইনের জনগণের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে সোদপুর লোকসংস্কৃতি ভবন থেকে পানিহাটির

মহোৎসবতলা ঘাট পর্যন্ত প্রতিবাদী জনতার স্বতস্ফূর্ত মিছিল সংগঠিত হয়। রাস্তার দু'ধারে কৌতূহলী মানুষের সমর্থনে মিছিল প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। চলার পথে পাঁচ জায়গায় সংক্ষিপ্ত পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল শেষে 'আহ্বানের' সাথীরা গণসংগীত পরিবেশন করেন।

রিপোর্ট : মেটিয়াবুরুজ মহেশতলা এপিডিআর শাখা

গত জুলাই মাসে খারাপ রাস্তা নিয়ে পোস্টারিং করা হয়েছিল। তার ফলে আংশিক সফলতা এসেছে। মেটিয়াবুরুজে হাটের সময় যানজট নিয়ে নাদিয়াল থানা এবং ট্রাফিক পুলিশকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। সেই সমস্যা অনেকাংশে মিটেছে।

৬ ই ডিসেম্বর, ২০২৩ কারবালা পিঙ্ক স্কোয়ারে পথসভা হয়েছে। ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৩ এ রবীন্দ্র নগর থানার বিরুদ্ধে শাখার তরফে যে কেস করা হয়েছিল তার শুনানি হয়েছে। রবীন্দ্র নগর থানা ৪ ঠা জুলাই, ২০২৩ একটি ডেপুটেশনের সময় মেটিয়াবুরুজ মহেশতলা শাখার সদস্যদের যথেষ্ট হেনস্থা করে এবং শাখার এক সদস্যকে অকারণ চড় মারে আর ফোন কেড়ে নেয়। এমন-কী অভিযোগকারীকেও মারধর করে। সেই ঘটনার জন্য শাখার পক্ষ থেকে আলিপুর কোর্টে মামলা করা হয়েছে। ১লা জানুয়ারী, ২০২৪, রবিবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন মেটিয়াবুরুজে বটতলা হাইস্কুল এ অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির ৯ টি শাখা অংশগ্রহণ করে। ৫৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। অত্যন্ত সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠান সফল হয়। এ-ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে পোস্টার লাগানো হয়েছে।

রিপোর্ট: হুগলী জেলার শাখাগুলির কর্মসূচি

১১/০২/২০২৪ চন্দননগর শাখার সম্মেলন

১৮/০২/২০২৪ হুগলী জেলার সম্মেলন

০২-০৩/০৩/২০২৪ চুঁচুড়া লিটিল ম্যাগাজিন মেলায় চুঁচুড়া শাখার অংশগ্রহণ

১১/০৩/২০২৪ হিন্দমোটরের এক নাবালিকার ধর্ষণের মামলার বিষয়ে হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানায় ও উলুবেড়িয়া কোর্টে পি পি'র সাথে আলোচনা।

১৫/০৩/২০২৪ চাঁপাডাঙ্গায় আলুচাষে বিপর্যয় নিয়ে আলোচনার জন্য কৃষি দপ্তরের উপ-অধিকর্তার (হুগলী) সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা। ১৮/০৩-এ ১১টায় সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ।

১৮/০৩/২০২৪ কৃষি দপ্তরের উপ- অধিকর্তার (হুগলী) সাথে চাঁপাডাঙ্গায় আলুচাষে বিপর্যয় নিয়ে আলোচনা।

২১/০৩/২০২৪ তারকেশ্বরের আস্তারা গ্রামে আলুচাষীদের সাথে আলুচাষে বিপর্যয় নিয়ে আলোচনা

২৪/০৩/২০২৪ কৃষি দপ্তরের বীজ প্রত্যয়ন সহ অধিকর্তার (হুগলী) সাথে আলোচনা

০৫/০৪/২০২৪ রিষড়া লক্ষ্মীপল্লী মোড়ে শ্রীরামপুর শাখার সিএএ ও এনআরসি বিরোধী পথসভা

০৭/০৪/২০২৪ নর্থ শ্যামনগর জুট মিলের গেটবাহার শ্রমিকদের সমস্যার তথ্যানুসন্ধান

০৭/০৪/২০২৪ পেশাগত রোগীদের সমস্যা নিয়ে এই বিষয়ে কাজ করছেন এমন একজন চিকিৎসকের সাথে আলোচনা।

০৯/০৪/২০২৪ নর্থ শ্যামনগর জুট মিলের গেটবাহার শ্রমিকদের সমস্যার বিষয়ে সিটু নেতৃত্বের সাথে আলোচনা

১৩/০৪/২০২৪ চুঁচুড়া শাখার পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল— সি এ এ এবং এন আর সি বিরোধী পথসভা

০৩/০৫/২০২৪ শ্রীরামপুর শাখার পথসভা। বিষয় ছিল— নিয়োগ দুর্নীতি-প্যানেল বাতিল।

রিপোর্ট: ডোমকল শাখা, মুর্শিদাবাদ

এপিডিআর ডোমকল শাখা সম্পাদককে মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল থানার মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

১ লা এপ্রিল, ২০২৪ সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য, মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সহ-সম্পাদক ও ডোমকল শাখার সম্পাদক আব্দুল গণির নামে ডোমকল এসডিএম কোর্টের একটি সমন আসে। নোটিশে বলা হয়, ডোমকল থানা আব্দুল গণির নামে ১০৭ ধারায় একটি অভিযোগ করেছে। ৩রা এপ্রিল ২০২৪ তাকে এসডিএম কোর্টে উপস্থিত হতে বলা হয়। ডোমকলের এক উকিলের সাথে যোগাযোগ করে সকাল দশটায় আব্দুল গনি ঐদিন উল্লেখিত কোর্টে উপস্থিত হয়। কোর্টে প্রায় তিন-চারশ লোকের ভিড় ছিল। প্রত্যেককেই ১০৭

ধারায় ডোমকল থানা থেকে কেস দিয়েছে। সকলেই এক বছর কোনও গন্ডগোল করবে-না বলে মুচলেকা দেয়। ব্যতিক্রম একমাত্র আব্দুল গণি। তিনি কোনও মুচলেকা না-দিয়ে কনটেস্ট করবে বলে সিদ্ধান্ত নেন।

পুলিশের আব্দুল গণির বিরুদ্ধে করা অভিযোগটি হল, আব্দুল গণি এলাকার শান্তি ভঙ্গ করছে। একজন ডেঞ্জারাস ও স্বভাবগতভাবেই ডেসপারেড লোক। আব্দুল গণি এলাকার লোককে ক্ষেপিয়ে তোলে, এলাকার লোককে ভয় দেখায়, এইরকম আরও অনেক কিছু। তাই আগামী লোকসভা নির্বাচনে আব্দুল গণি ঝামেলা পাকাতে পারে, এলাকার শান্তি ভঙ্গ করতে পারে, তাকে আটক রাখার দরকার। উকিলবাবু কোর্টে এর বিরুদ্ধে কনটেস্ট করেন। শেষ পর্যন্ত অনেক বাদানুবাদের পর বিচারক সামনের একটি তারিখ দেন এবং পুলিশকে তার সাক্ষী নিয়ে আসতে বলেন। যদিও পুলিশের অভিযোগটিতে একজন মাত্র সাক্ষীর নাম ছিল। তার আবার বাড়ির কোনও ঠিকানাই ছিল না। বোঝাই যাচ্ছিল ভুয়ো সাক্ষী।

কোর্টে একটি অভূতপূর্ব বিষয় সামনে আসে। বিচারক যেন ধরেই নিয়েছিলেন আব্দুল গণি দোষী। বিচারক আব্দুল গণিকেই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য বলছিলেন, যা সম্পূর্ণভাবে বর্তমান ফৌজদারি আইনের নীতি বিরোধী। বর্তমান ফৌজদারি আইন যে মুলনীতির ওপর চলে তা হল, অভিযোগকারীকে প্রমাণ করতে হবে অভিযুক্ত দোষী। আব্দুল গণির উকিল বিচারকের এই অনুদার আবদারের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, ডোমকল থানা আব্দুল গণির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, তাই ডোমকল থানাকেই সাক্ষীসহ কোর্টে এসে প্রমাণ করতে হবে আব্দুল গণি দোষী। শেষ পর্যন্ত বিচারক পুলিশকেই সাক্ষীসহ কোর্টে আসার দিন ধার্য করেন।

বর্তমান পরিস্থিতি সংগঠনের কাছে একদমই সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না। এলাকার বিভিন্ন অধিকার আন্দোলনের সাথে আব্দুল গণি বহুদিন থেকে জড়িয়ে আছে। বহু বছর ধরে এপিডিআর করছে। বর্তমানে তিনি ডোমকল শাখা সম্পাদক হিসাবে বহু অধিকার ইস্যুতে আন্দোলন সংগঠিত করার সাথে জড়িয়ে। বিএসএফের অত্যাচার, এনআইএ'র অত্যাচার, এলাকার মূল অর্থকরী ফসল পাটের ন্যায্য মূল্য, সার, বীজের দাম বৃদ্ধি ও এলাকায় কালোবাজারির বিরুদ্ধে, ভূমিহীন কৃষক ও পরিযায়ী শ্রমিকদের এলাকায় জমির অধিকার-কাজের অধিকার, পাট্টা পাওয়া জমি থেকে কৃষকদের উৎখাত করার বিরুদ্ধে, নিঃশর্ত রাজনৈতিক বন্দি মুক্তি, বন্দুকের নলের ডগায় নির্বাচনী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, বিরোধী চিন্তার প্রতিবাদী যুবকদের বেছে বেছে পানিকেস অর্থাৎ নারকোটিক কেস দেওয়া ইত্যাদির বিরুদ্ধে ডোমকল শাখার উদ্যোগে রাস্তায় লোক জমায়েত করে মিছিল, মিটিং, অবস্থান, ডেপুটেশনে সম্পাদক হিসাবে আব্দুল গণি সামনেই থাকেন। কিছুদিন আগেই বাইকের কাগজ দেখার নাম করে এলাকার এক বাইক আরোহীকে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ডোমকল থানার পুলিশ মারধর করে। এর বিরুদ্ধে ডোমকল শাখা দোষী পুলিশ অফিসারের নাম করে শাস্তির দাবিতে থানার একদম সামনে প্রচুর মানুষকে নিয়ে এলাকায় সারা জাগানো এক গণ অবস্থান করে। অবস্থান মঞ্চ থেকে ভিকটিম, ভিকটিমের পরিবার ও শাখার অনেকে মিলে গিয়ে ডোমকল এসডিপিও এবং থানার আইসিকে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়। শুধু ডোমকল নয়, গোটা জেলা জুড়ে দোষী পুলিশ অফিসারের নাম সহ কর্মসূচির খবর হয়। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ারা ভালই কভার করে। এসপির কাছেও অভিযোগ করা হয়। পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে জেলা আদালতে কেস করারও ব্যবস্থা চলছে। আমাদের ধারণা এসবেরই প্রতিহিংসায় ঠিক নির্বাচনের আগে মিথ্যা মামলা দিয়ে এলাকার পুলিশ ও শাসক দল মিলে আব্দুল গণিকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। গ্রামে গঞ্জে যারা এপিডিআরের নেতৃত্বে আছে এবং অধিকার আন্দোলনের সাথে ভালই সম্পৃক্ত, তাদের বেছে বেছে পুলিশ ও এলাকার শাসক দল আক্রমণ করছে। পুলিশের এই প্রতিহিংসামূলক আক্রমণ ক্রমাগত বাড়ছে।

এপিডিআর ডোমকল শাখা, মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি ও কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলী আব্দুল গণির অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার এই অনমনীয় মানসিকতার পাশে আছে।

কেন্দ্রীয় রিপোর্ট: এপিডিআর-এর ২৯ তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল মালদায়

২ রা ও ৩ রা মার্চ, শনিবার ও রবিবার, মালদায় (ডি এস এ স্টেডিয়াম হল) অনুষ্ঠিত হল এপিডিআর-এর ২৯ তম দ্বি-বার্ষিক কেন্দ্রীয় সম্মেলন। মোট ৫১ টি শাখার ৩২৭ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এই সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

সম্মেলনের প্রথম দিন (২ রা মার্চ, শনিবার) সকাল ১০-৩০ টায় শহীদবেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে আয়োজক শাখার সভাপতি নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়, তাপস চক্রবর্ত্তী, সোমনাথ বসু ও সঞ্জীব আচার্যের সভাপতিত্বে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। সম্মেলন হ'ল থেকে এক উদ্দীপ্ত মিছিল শহর

পরিক্রমা করে উত্তরবঙ্গ সহ রাজ্যের বিভিন্ন অধিকারের দাবিকে সামনে রেখে। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় মালদা টাউন হলে হয় প্রকাশ্য অধিবেশন।

প্রকাশ্য অধিবেশনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ছত্তিশগড়ের অধিকার আন্দোলনের সুপরিচিত কর্মী বেলা ভাটিয়া এবং ঝাড়খণ্ডের অধিকার রক্ষা সংগঠনের (জে সি ডি আর) এর প্রতিনিধি সাংবাদিক মানব চৌধুরী।

দ্বিতীয় দিন, রবিবার, সকাল নটা থেকে সম্মেলন শুরু হয়ে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত চলে।

এই সম্মেলনে, নানা রূপে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, বন্দি মুক্তির দাবিতে, রাজ্যে বি এস এফ এবং এনআইএ এর অত্যাচার, গঙ্গা ভাঙন, এন আর সি-সি এ এ এর বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং কর্পোরেটের স্বার্থে শাসকদলের জমি দখলের বিরুদ্ধে কাজ করায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। একই সাথে, দলিত-আদিবাসীদের অধিকার, জল জঙ্গল জমির অধিকারের ওপর কর্পোরেট আগ্রাসন-সুন্দরবনের মৎসজীবী-মৌলেদের অধিকার নিয়ে কাজ করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয় সংগঠন।

অধিকার রক্ষার দাবিতে আলাদা করে গৃহীত হয় আটটি প্রস্তাব। মেরুকরণ, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও ধর্মীয় ফ্যাসীবাদি শক্তির বিরুদ্ধাচরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সন্দেশখালির সাম্প্রতিক ঘটনাবলীকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে প্রচার আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়।

এপিডিআর এর মালদা ও গাজোল শাখার কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকতা সম্মেলনকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করে। দু'দিনে মোট ৬৩ জন প্রতিনিধি নানা দিক থেকে সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করে প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেন।

সম্মেলন থেকে আগামী দু'বছরের জন্য ৪৯ জনের রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী নির্বাচিত হয়। সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি : বাপী সেনগুপ্ত

কার্যকরী সভাপতি : তাপস চক্রবর্তী

সাধারণ সম্পাদক : রঞ্জিৎ শূর।

সভাপতি মন্ডলীকে ধন্যবাদ জানিয়ে সম্মেলন শেষ হয়।

অধিকার পত্রিকার ফেব্রুয়ারি সংখ্যা বের হওয়ার পর কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মসূচি ১৯ শে ফেব্রুয়ারি সন্দেশখালি তে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক রাজ্য পুলিশের সহযোগিতায় সন্ত্রাস ও অন্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে এপিডিআর এর প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে একটি আলোচনা সভা ও নাগরিক কনভেনশন এর আয়োজন করে। সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বিভিন্ন সংগঠন এর প্রতিনিধি এ বিষয়ে তাদের মত ব্যাখ্যা করেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করে ঘুরপথে এনআরসি লাগুর চেষ্টার বিরুদ্ধে একটি নাগরিক মিছিলের আয়োজন করা হয়।

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, কলকাতা পুস্তক মেলায় গণতান্ত্রিক পরিসর নষ্ট করে বাণিজ্যিক মেলায় পরিণত করা ও প্রতিবাদীদের উপর হিন্দুত্ববাদী ও পুলিশি জুলুমের বিরুদ্ধে আন্দোলনে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য একটি আলোচনা সভার মাধ্যমে বিভিন্ন সংগঠন কে আহ্বান করা হয়।

২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, মেদিনীপুর আদালতে শিলদায় ২৩জন রাজনৈতিক কর্মীর বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন সাজার রায়ের বিরুদ্ধে কফি হাউসের সামনে একটি বিক্ষোভসভা আয়োজন করা হয়।।

১৩ মার্চ ২০২৪, কলকাতা পুস্তক মেলায় পুলিশ জুলুমের বিরুদ্ধে কলকাতা বুক সেলার্স এন্ড পাবলিশার্স এর গিল্ড অফিসে ডেপুটেশন দেবার জন্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকার প্রতিনিধি সহ যৌথভাবে মিছিল করে যাওয়া হয়।

১৮ মার্চ ২০২৪, হাজরায় এনআরসির বিরুদ্ধে পথসভা নির্বাচনের অজুহাতে পুলিশের অসহযোগিতা র জন্য বাতিল করা হয়।

২২ মার্চ ২০২৪ কফি হাউসের সামনে থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত এনআরসি বিরোধী যৌথ মিছিলে অংশগ্রহণ করে সংগঠনের বহু সদস্য। সঙ্গে সংগঠনের তরফে এনআরসি-সিএএ বিরোধী বক্তব্য রেখে লিফলেট বিলি করা হয়।

১৮ এপ্রিল ২০২৪ ছত্রিশগড়ে প্রতিবাদী আদিবাসীদের উপর আকাশ পথে বোমাবর্ষণ, ভুয়ো সংঘর্ষে রাজনৈতিক কর্মীদের হত্যা সহ ভয়াবহ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধের দাবিতে, মেদিনীপুরে শিলদা মামলায় অন্যায়ভাবে ২৩ জন রাজনৈতিক বন্দিকে 'যাবজ্জীবন' সাজা দেওয়ার প্রতিবাদে ও কল্পনা মাইতি, ঠাকুরমণি মুর্মু, জয়িতা দাস সহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে বৌবাজার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সামনে প্রতিবাদী নাগরিক সভায় সংগঠনের সদস্যরা ও অন্যান্য সংগঠনের বক্তারা বক্তব্য রাখেন।

২৭ এপ্রিল ২০২৪, ভারত সভা হলে ছত্রিশগড়ে আদিবাসী

নাগরিকদের উপর ড্রোন হামলা বোমা বর্ষণ ও এনকাউন্টারের নামে গণহত্যার বিরুদ্ধে নাগরিক সভায় বক্তব্য রাখেন আমন্ত্রিত ছত্তিশগড় আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী ও সমাজকর্মী আইনজীবী বেলা ভাটিয়া ও চিত্র নির্মাতা সৌমিত্র দস্তিদার। অন্যান্য গণ সংগঠনের প্রতিনিধিরা তাদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সভায় বিভিন্ন সংগঠন ও সমাজকর্মীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

২৯ এপ্রিল ২০২৪ এসএসসি মামলার রায় বাতিলের দাবিতে হাজরা মোড়ে নাগরিক সভা হয়। এসএসসি রায় বাতিল ছাড়া ছত্রিশগড়ে গণহত্যা ও সি এ এ বাতিলের দাবিতে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। সভার আশেপাশে উৎসুক শ্রোতাদের মন দিয়ে বক্তৃতা শুনতে দেখা যায়।

৬ মে ২০২৪, এসএসসি মামলার রায়ে নিরাপরাধ ব্যক্তিদের চাকরি রদের আদেশ বাতিলের দাবিতে কলেজ স্ট্রিট মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল এর সামনে পথসভার আয়োজন।

শুভেচ্ছা বার্তা

আদালতের কাজে দুই সপ্তাহ সবিশেষ ব্যস্ত থাকায় এপিডিআর-এর ২৯ তম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে সংহতি জ্ঞাপক বার্তা পাঠাতে দেরি হয়ে যাওয়ার জন্য দুখঃপ্রকাশ করে সুরেশ (ভি সুরেশ, সাধারণ সম্পাদক, পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ, তামিলনাড়ু)'র পাঠানো শুভেচ্ছা বার্তা।

২৯ ফেব্রুয়ার, ২০২৪

রঞ্জিত শূর,

সাধারণ সম্পাদক, এ পি ডি আর

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

এবং প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ সমীপে,

পশ্চিমবঙ্গের মালদায় ২ রা ও ৩ রা মার্চ, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠেয় আসোসিয়েশন ফর প্রোটেকশন অফ ডেমক্রেটিক রাইটস-এর ২৯তম দ্বি-বার্ষিক কেন্দ্রীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে পি ইউ সি এল সৌভ্রাতৃত্বমূলক অভিনন্দন জানাচ্ছে। আমরা নিশ্চিত এই সম্মেলন তাৎপর্য্যপূর্ণ সাফল্য লাভ করবে। এবং শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় সমগ্র ভারতের জন্য মানবাধিকার আন্দোলনের নতুন দিশা সর্বসমক্ষে উন্মোচন করবে।

সম্মেলনের জন্য নির্ধারিত সময়টি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এ'টি লোকসভা নির্বাচনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ফলে, মোদী নেতৃত্বাধীন সরকারের দশ বছরের শাসন শুধুমাত্র মানবাধিকারের উপর নয়, ভারতীয় সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাংবাধানিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপরেহ কী প্রভাব ফেলেছে এই বিষয়ে সামগ্রিক অনুপূঙ্খ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার সুযোগ এনে দিয়েছে। এই দশ বছর ধরে আমরা দেখেছি পরিকল্পিত ও ধারাবাহিক সামজিক ও রাজনৈতিক হিংসার সম্প্রসারণ। সংখ্যাগুরুবাদীদের হাতে সংখ্যালঘু মুসলমান ও খ্রীষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ ও হত্যাকান্ড, দলিত বিরোধী ও লিঙ্গভিত্তিক হিংসা এবং পরিযায়ী শ্রমিক, বস্তিবাসী লিঙ্গগতভাবে সংখ্যালঘু, অন্যান্য দুর্ব লতম সবচেয়ে প্রান্তিক অবস্থানের মানুষদের উপর আক্রমণ এবং বিভিন্ন ধরণের স্বৈরাচার। শত-শত প্রকৃতপক্ষে হাজার-হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। বাড়ি-ঘর ধ্বংস করা হয়েছে এবং অসংখ্য মানুষকে সর্বস্বান্ত ও আশ্রয়হীন করা হয়েছে। বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি তআইনের শাসনদ বলবৎ করার দায়িত্ব পরিহার করে সংখ্যাগুরুবাদী বাহিনীর সমর্থনে পক্ষপাতিত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

অবশ্য হিংসার ব্যাপকতা ভয়াবহ হওয়া সত্ত্বেও আরও অনেক বেশি ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছে যে-ভাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার স্থির সংকল্প ও নিঃশব্দ কুটিলতায় সাংবিধানিক শাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতি কমিশনের মত অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, মহিলা কমিশন এমন-কী সাংবিধানিক ন্যায়ালয়গুলিই ভেঙে ফেলা, অকেজো করে দেওয়া এবং ধ্বংস করার কাজ চলছে। যে সমস্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার রক্ষাণাবেক্ষণ এবং সতর্ক প্রহরার কাজ স্বাধীনভাবে করার জন্য বিধিবদ্ধ হয়েছিল সেগুলিকে আজ নিতান্তই নিস্প্রয়োজনীয় করে তোলা হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে সেগুলি সরকারের বশংবদ অনুচর হিসেবে শাসকদের ক্রিয়াকলাপ অনুমোদন ও সমর্থন করে আইনের শাসন ধ্বংস করার কাজ সর্বতোভাবে করে চলেছে। ভিন্নমত দমন করা এবং বিরোধী গোষ্ঠী ও দলগুলিকে হয়রানি করার জন্য আইনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার সংগে যুক্ত হয়েছে এন আই এ , সি বি আই, ই ডি, আই টি বিভাগ ও অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থাগুলির বল্গাহীন ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ অপ ব্যবহার।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার একনিষ্ঠ অনুগামী আগ্রাসী হিন্দুত্বের সংখ্যাগুরুবাদী সরকারের চরম সাফল্য প্রদর্শিত হয়েছিল ২০২৪-এর ২২ জানুয়ারী অযোধ্যার অবলুপ্ত বাবরি মসজিদের

জমিখন্ডের উপর নব নির্মিত রামমন্দিরের প্রতিস্থাপন। স্থান কাল উপলক্ষ ও আবেগের সংগে পরিকল্পিতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ আবহে এবং গণমাধ্যমের চমকপ্রদ ব্যপক প্রচার আতিশয্যে ঘটনাটিকে রাষ্ট্র সমর্থিত পবিত্র ক্রিয়াকান্ড হিসাবে মেলে ধরা হয়েছিল। ধর্মান্ধতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভেদরেখার ন্যুনতম চিহ্নও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নস্যাৎ করা হয়েছিল-প্রকতভাবে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল ভারতের সাংবিধানিক শাসনতন্ত্রের বনিয়াদি কাঠামোর অন্তর্নিহিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধ্যানধরণা, লক্ষ্য ও আদর্শ- ধর্মনিরপেক্ষতা এবং রাষ্ট্র, সরকার, প্রসাশন, আইনসভা ও বিচারব্যবস্থার ক্ষমতার বিভাজন বিন্যাস উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সচেতন প্রয়াসে ধ্বংস করে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

বস্তুত আমরা দু'টি সুস্পষ্ট প্রক্রিয়ার উত্থান দেখতে পাচ্ছি। একদিকে সব ধরণের গণতান্ত্রিক দাবিকে দন্ডনীয় আপরাধ বলে গণ্য হচ্ছে। আইনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সংখ্যাগুরুবাদী প্রকল্পের বিরুদ্ধে কোন গোষ্ঠী অথবা দলের প্রতিবাদ অথবা প্রতিরোধকে দমন করার জন্য সুপরিকল্পিত এবং সুব্যবস্থিত হিংসাকে রণকৌশলের অংশ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। অন্যদিকে ভারতবাসীর হৃদয়-মন-সত্ত্বাকে এমনভাবে বিনির্মাণ ও বিনির্ণয় করতে চাওয়া হচ্ছে যাতে তারা ধনতান্ত্রিক সংখ্যাগুরুবাদী হিন্দুত্ব ভিত্তিক রাষ্ট্র এবং তার নেতৃত্ব হিসাবে একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ অন্ধভাবে বিচার-বিবেচনাহীন আনুগত্য সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে। ফ্যাসিবাদী মতাদর্শ ভিত্তিক একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে জনসাধারণের কাজে নিতান্ত স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করার বৃহত্তর কর্মসূচিই গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের কাছে গুরুতর বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে। সুতারাং একদিকে বহুবিধ ভীতিপ্রদর্শন, অবদমন ও একমাত্রিক এবং পরিকল্পিত বহুমাত্রিক বৈষম্যমূলক আচরণ ও হিংসার বিরুদ্ধে আমাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে লড়াই করা ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প নেই। অন্যদিকে ডক্টর আম্বেদকর যে ত সাংবিধানিক নৈতিকতাদ-র নীতিসূত্রের উল্লেখ করেছিলেন তার ভিত্তিতেই সচেনতা এবং সামাজিক বোধ নির্মাণের কাজকে অগ্রাধিকার দিতেই হল। কেবলমাত্র প্রাণপ্রাচুর্য্যে ভরপুর, ভাল-মন্দ বিচার ক্ষমতা সম্পন্ন এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন নাগরিক সমাজ নির্মাণ করার মধ্য দিয়েই আমরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হতে পারবো এবং সাংবিধানিক ও সংবিধানের প্রস্তাবনা অংশে বিধৃত ন্যায়, ন্যায্যতা, স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদা, ভ্রাতৃত্ব, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবায়িত করতে পারবো।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মূল্যবান ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার সমৃদ্ধ এ পি ডি আর এইরকম একটি কঠিন লড়াইয়ের ইতিকর্তব্য সম্পাদনে এক অনন্য অবস্থানে সমারূঢ়।

একটি সফল সম্মেলনের জন্য আমরা শুভকামনা জানাই। এ পি ডি আর সম্মেলনের তর্ক-বিতর্ক আলাপ আলোচনার প্রতিবেদন পাঠের জন্য আমরা আগ্রাহান্বিত রইলাম।

---

১৭ পাতার পর

আমার ভারত ওদের ভাষ্য

১৩) পাঞ্জাবে ৭ই মার্চ, ২০০৪ সালে এক দলিত রমণীর শ্লীলতাহানির বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ চলছিল। পুলিশ হিংস্রভাবে লাঠি চালায়, তাদের মারতে-মারতে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এমন-কী মহিলারাও নিষ্কৃতি পাননি।

১৪) ২০০৩ সালের জানুয়ারীতে অন্ধ্রপ্রদেশের ওঙলেতে একটি পথ দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের না-পাওয়া ক্ষতিপূরণের দাবিতে দলিতদের একটি প্রতিবাদ মিছিল চলছিল। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, তাদের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবাদকারীদের মিছিলের উপর আক্রমণ এবং নির্মমভাবে তাদের পেটানো হয়। এইভাবে তাদের আদালতে বিচার চাইতে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়।

১৫) ২০০৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি, হরিয়ানার হিসারের আম্বেদকার কলোনি বিজয় কুমার নামে এক দলিত যুবকের অপহরণ ও হত্যার বিরুদ্ধে দলিদ্রদের প্রতিবাদ চলছিল। উচ্চবর্ণের যাদের বিরুদ্ধে অপহরণ ও হত্যার অভিযোগ তারা উচ্চবর্ণের মানুষ হওয়ায় পুলিশের সুরক্ষায় বহাল তবিয়তে আছে।

১৬) ২০শে জুলাই, ২০০৪ সালে, উত্তরপ্রদেশের বারাবাঁকি সিদ্ধপুরের ধান্যাই গ্রামের এক দলিত বাসিন্দা শালিকরাম মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেন রাস্তা তৈরির জন্য যেন তার জমি কেড়ে না-নেওয়া হয়।মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি লেখার স্পর্ধা দেখানোয় স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের যোগসাজশে পুলিশ তাকে মিথ্যা মামলায় লক আপে পুরে দেয়।